নেহরু বাল পুস্তকালয়

NEHRU
BAL PUSTAKALAYA

৪·৪

বাঘের মাসী বেড়াল

২২৩৩

৭৫

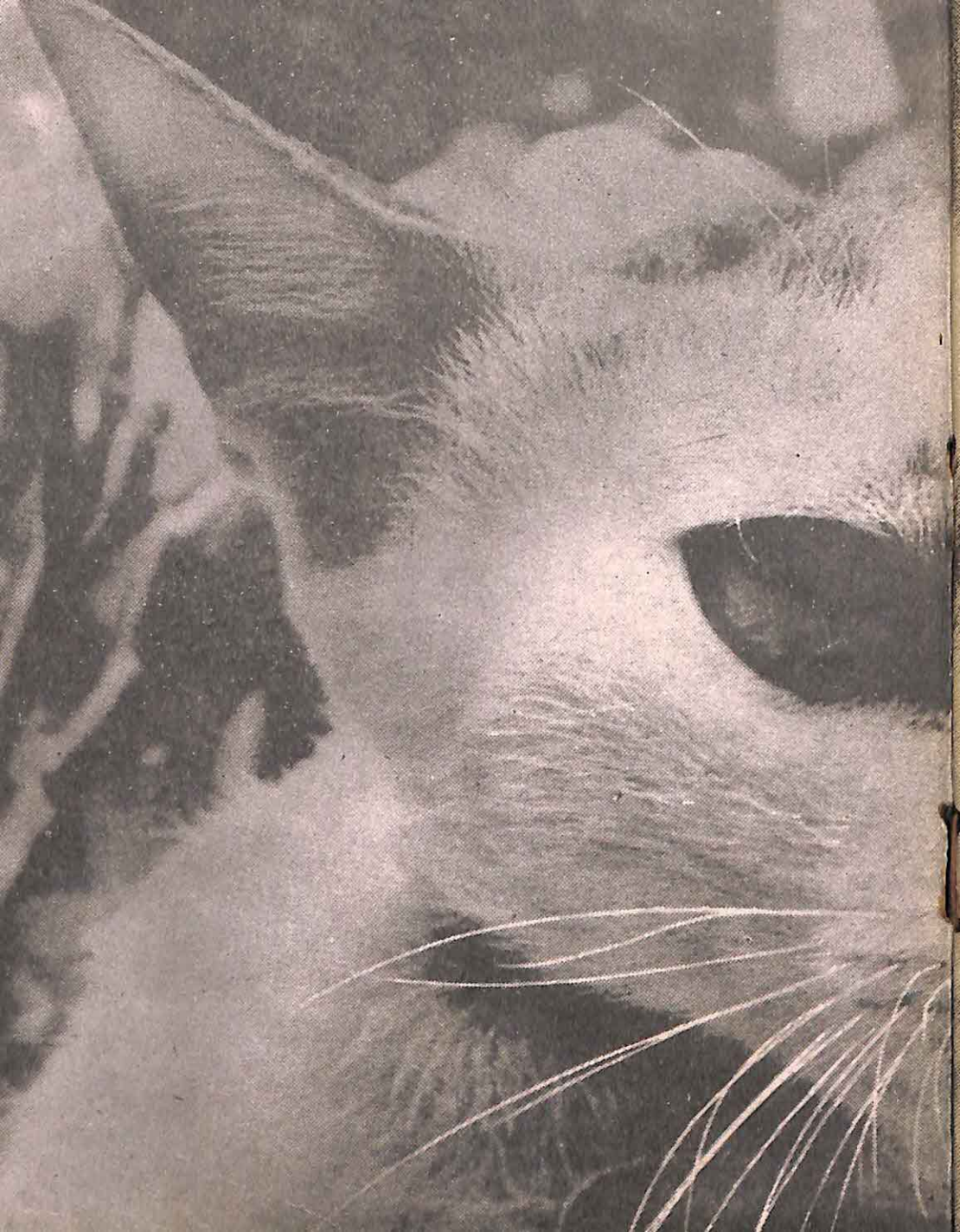

৪·৪

লেখক বাল পুস্তকালয় — ১৩

বাঘের মাসী বেড়াল

এম. ডি. চতুর্বেদী

অনুবাদ : ইন্দ্রাণী সরকার

১১৩৩

ACC NO - 15067

নেহরু বাল পুস্তকালয়, নয়া দিল্লি

বেড়াল পরিবারে অনেক জন্তুকেই ধরা যায়। এদের মধ্যে যারা অগ্রগণ্য আর আমাদের দেশে যাদের দেখতে পাওয়া যায় তাদের কথাই শুধু এই বইয়ে বলা হয়েছে। যেমন বাঘ, সিংহ, গুলবাঘ বা চিতা ও শিকারী চিতা লেখক শ্রী এম. ডি. চতুর্বেদী নিজেই একজন বড় শিকারী ছিলেন। বেড়াল পরিবারের ছোট বড় সব রকম জন্তু নিয়ে তিনি তিরিশটা বছর কাটিয়েছেন। বেশির ভাগই উত্তর প্রদেশের জঙ্গলে। বন্য পশুদের সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১৯৬৮ সালে এই বইটি লেখেন।

1972 (*Saka* 1893)
Reprinted 1980 (*Saka* 1902)
Reprinted 1986 (*Saka* 1908)

© এম. ডি. চতুর্বেদী

National Book Trust, India
REVISED PRICE Rs.5.00

আলোকচিত্র :
ওয়াইল্ড লাইফ সোসাইটি, শ্রীকাশীনাথ, শের জঙ্গ সিং, শ্রীদেবনাথ ও মারওয়ারের সৌজন্যে।

THE CAT FAMILY *(Bengali)*

Published by Director, National Book Trust, India,
A-5 Green Park, New Delhi-110016 and printed by
Jupiter Offset Press, B-10/3, Jhilmil Industrial Area,
Delhi-110032

বাঘ

বাঘ দেখে কে না ভয় পায়। নামেই বুক কাঁপে, গায়ে কাঁটা দেয়। বাঘের কথা কতই তো শুনি, জানি কতটুকু। বাঘ দেখতে কেমন, অনেকেই হয়ত বলতে পারবে না। সিংহ, গুলবাঘ বা চিতা, শিকারী চিতা এমন কি হায়না 'শের' বা বাঘ নামেই পরিচিত। গাঁয়ের লেখাপড়া না জানা লোকেদেরই শুধু যে এই ধারণা তা নয়, শহুরে শিক্ষিত লোকেরাও এই একই ভুল করে।

ভুল ধারণার অনেক কারণ আছে। ভারতে এখন বাঘের সংখ্যা খুবই কম। যাও বা আছে তা গভীর জঙ্গলে। বাঘেরা দিনের আলোয় নিজেদের ডেরা ছেড়ে বড় একটা বেরোয় না। তাই খুব কম লোকেরই চোখে পড়ে।

বাঘ দেখতে ঠিক বেড়ালের মত। আকারটাই যা বড়। বেড়ালের মত লম্বা ছিপছিপে গড়ন। নরম গোদা থাবা, শক্ত সাদা গোঁফ আর খরখরে জিভ। বেড়ালের মতই তীক্ষ্ণ এদের দেখার, শোনার ও শোঁকার ক্ষমতা।

ঠিক সেরকম চালাক, চলে ভারিক্কী চালে চুপিসাড়ে। একা থাকতেও ভালবাসে। রাতে শিকার ধরে। মাংস এদের খুব প্রিয়। পরিষ্কার ও ছিমছাম, চলাফেরাও করে তাড়াতাড়ি। বেড়ালকে এইজন্যেই বোধহয় আমাদের দেশে বাঘের মাসী বলে।

অনেকে বলে, বেড়াল মাসী বাঘকে সবই শিখিয়েছে, শেখাইনি শুধু গাছে চড়তে। এই ধারণাটা কিন্তু পুরোপুরি ঠিক নয়। চিতা বাঘের মত বাঘ অত সহজে গাছে চড়তে পারে না বটে, কিন্তু দরকার হলে পারে। এই ধরো, বন্যার সময়, বাঘকে দেখবে গাছে চড়ে মগ ডালে বসে আছে।

কত রকমেরই না বাঘ। এদের হাবভাব ও রকমসকম বুঝতে হোলে আগে কোন্ কোন্ দেশে বাঘ পাওয়া যায় তা জানতে হবে। পূর্ব এশিয়াতেই শুধু বাঘ পাওয়া যায়। উত্তর বা দক্ষিণ আমেরিকা কিংবা অষ্ট্রেলিয়ায় নয়। এমন কি আফ্রিকা, যেখানে সিংহ, চিতা ও আরও নানান ধরণের হিংস্র জংলী পশুদের দেখতে পাওয়া যায়, সেখানেও বাঘ মেলে না। বাঘের আসল ঘরবাড়ী উত্তর রাশিয়ায় অনুমান করা হয়। এখান থেকেই এরা পূর্বে মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, চীন, বর্মা, থাইল্যাণ্ড, ভিয়েতনাম, জাভা, সুমাত্রা ও বালী দ্বীপে ছড়িয়ে পড়েছে। সিংহলে কিন্তু বাঘ পাওয়া যায় না। এতেই বোঝা যায় এরা সিংহলে পৌঁছোবার আগেই ভারত ও সিংহলের মধ্যে ডাঙ্গা দিয়ে যাওয়ার যে পথটা ছিলো, সেটা জলে ডুবে যায়। বর্মা দিয়েই এরা ভারতে ঢোকে। আস্তে আস্তে আসামে, বাংলাদেশে, হিমালয়ের পাদদেশে, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে এরা আস্তানা গাড়ে। গভীর বনে, উপত্যকায়, গুহায়, পাহাড়ী জঙ্গলে আর নদনদীর পাড়ে সাধারণত এরা ডেরা বাঁধে। হিমালয় পাহাড়ের ২৪০০ থেকে ২৭০০ মিটার উঁচু জায়গাতেও বাঘ দেখতে পাওয়া যায়।

ভিন্ন ভিন্ন জায়গার জল-আবহাওয়াও ভিন্ন। তাই এদের চেহারা, হাবভাব ও চালচলনে এতো তফাত। বাঘ নানান জাতের, নামকরা যায় চার রকমের।

(১) মাঞ্চুরিয়া-কোরিয়া জাতের বাঘঃ আকারে সবচেয়ে বড়, গায়ের জোরও বেশি। সারা গায়ে বড় বড় লোম। বরফ ও ঠাণ্ডা থেকে এদের বাঁচায়। গায়ের ধারীগুলোর রংও বেশ হাল্কা।

বাঘের গায়ের এই রঙও ডোরাকাটা দাগগুলো আত্মরক্ষায় এদের সাহায্য করে। গরমের সময় গাছের শুকনো পাতার সোনালী রঙের সঙ্গে আর শুকনো ঝোপঝাড়ের মাঝে এদের গায়ের রঙ এমনভাবে মিশে যায় যে দেখতে পাওয়াই ভার। একবার পিলিভিতের জঙ্গলে একটা আহত বাঘের সন্ধানে ফিরছিলাম। আমরা চার বন্ধুতে মিলে হাতীর পিঠে চেপে খুব সাবধানে চারিদিক খোঁজাখুঁজি করছি। কিছুতেই বাঘের হদিশ মেলে না। হঠাৎ একটা ঝোপের আড়াল থেকে বাঘটা যখন আমাদের হাতীর মাথার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো তখনই তাকে দেখতে পেলাম।

বাঘেদের মধ্যে সবচেয়ে নামকরা সাদা বাঘ। নৃপতি শাসিত রাজ্য রেওয়াতে পাওয়া যায়। বন্দী অবস্থায় সাদা বাঘ বাচ্চা দেয়। বাচ্চাও বন্দী অবস্থায় বড় হয়ে ওঠে। এদের গায়ের রঙ ধূলোটে, তার ওপর চকলেট ও বাদামী রঙের ডোরাকাটা।

বেড়াল কিংবা চিতার মত এরা জল দেখে ভড়কায় না। জলকে এড়িয়েও চলে না। গরমকালে বাঘেদের প্রায়ই খানাডোবায় গা ডুবিয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। সাঁতার দিতেও ওস্তাদ। নেপাল থেকে সাঁতার দিয়ে সারদা খাল পেরিয়ে এরা ভারতে এসেছে, একথা আমাদের অজানা নয়।

বেড়াল জাতের জন্তুরা খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাঘও নিজেকে খুব পরিষ্কার রাখে। তবু বাঘের গায়ে একটা বিশ্রী ঝাঁজালো বোট্‌কা গন্ধ। এই গন্ধই তার শিকারদের সতর্ক করে দেয়। বাঘের নখও বেড়ালের মত এদের নরম মাংসল থাবার মধ্যে লুকানো থাকে। মাঝে মাঝে গাছের ছালে নখগুলো ঘষে একটু শানিয়ে নেয়।

বাঘের কান বড় সতর্ক, ফিসফিস শব্দও কানে পৌঁছোয়, বিপদ বুঝলেই লুকিয়ে পড়ে।

খাওয়ার সময় শুকনো সরু ডাল ভাঙ্গার সামান্য একটু শব্দেও এরা শিকার

ছেড়ে লুকিয়ে পড়ে। বিপদ ঘাড়ে নেওয়ার চেয়ে খিদের জ্বালা সহ্য করা এদের কাছে অনেক সহজ। একবার কি হয়েছিলো জানো। এক শিকারী একটা বাঘকে ধরার জন্যে অপেক্ষা করছিলো। সময় কাটাতে শিকারী বই পড়ছিলো। বইয়ের পাতা উল্টোনোর খসখস শব্দ শুনে বাঘ তার মুখের গ্রাস ফেলে দুরাত্তির লুকিয়ে কাটালো।

রোদ্দুর বাঘের মোটেই পছন্দ নয়। সারাটা দিন তাই ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। অন্ধকার হলেই পুরোপুরি চোখ মেলতে পারে। আঁধারেই ভালো দেখতে পায়। টর্চের আলোয় চোখদুটো আগুনের মত জ্বলতে থাকে।

কুকুর, শেয়াল বা চিতার মত বাঘের ঘ্রাণ-শক্তি অতটা তীব্র নয়। রাতের অন্ধকারে কিন্তু শুঁকে শুঁকেই এরা শিকার ধরে।

বাঘ নিঃশব্দে চুপিসাড়ে শিকার করে। সঙ্গীকে ডাকতেই যা হাঁক ছাড়ে। আর বাঘিনী শিকার করতে যাবার সময় ডাক দিয়ে বাচ্চাদের জড়ো করে।

বাঘের উঁচু জায়গা খুব পছন্দ। বসার সময় তাই আশপাশের সবচেয়ে উঁচু জায়গা বেছে নেয়। শীতের সময় পাথরের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে রোদ পোয়ায়।

এদের বিরক্ত না করলে অযথা কাউকে আক্রমণ করে না। আলো, গোলমাল আর ভিড়ভাড়াক্কা এড়িয়ে চলে। আহত বাঘ কিংবা বাচ্চাদের পাহারা দেয় যে বাঘিনী—এদেরই শুধু হিংস্র হতে দেখা যায়। শিকারীদের কারুর কারুর মতে বাঘ শেয়ালের চেয়ে ভীরু। জখম না হলে বাঘের সাহস ও বীরত্ব জাগে না। রাখাল বালকেরাও গরু চরাতে চরাতে বাঘকে শুধু চেঁচিয়েই তাড়ায়। বনেজঙ্গলে অন্য জন্তু জানোয়ারেরা বাঘ দেখলে কিংবা বাঘের গায়ের গন্ধ পেলে ডাক দিয়ে সবাইকে সাবধান করে দেয়! খেপা হনুমান ও বাঁদরের কিচকিচ আওয়াজ, হরিণ জাতের পশু সাম্ভর

কিংবা ছোপকাটা চিতলের একটানা ডাক, মায়াহরিণ বা কাকারের অদ্ভুত অস্বাভাবিক চিৎকার, বুনো মোরগ আর ময়ূরের ডাক—সব কটা আওয়াজের প্রতিধ্বনি শোনা গেলে বাঘ পালিয়ে বাঁচে।

বুনো শুয়োর বাঘের মুখোমুখি হতেও ভয় পায় না। বুনো মোষও

বাঘের কবল থেকে অনায়াসেই নিজেকে বাঁচাতে পারে। সাধারণত বাঘ আলো ও আগুনে ভয় পায়। মানুষখেকো বাঘ শিকার পাবার লোভে কিন্তু আলোর দিকে এগিয়ে যায়।

বাঘ খুব সাবধানে, আস্তে আস্তে ও চুপিসাড়ে আঙ্গুলে ভর দিয়ে চলে। পা ফেলে এক মিটার তফাতে। এদের সামনে দুটো পা, প্রত্যেকটায় পাঁচটা করে নখ। পেছনের দুপায়ে কিন্তু চারটে করে। সামনের পা দুটো পেছনের পায়ের চেয়ে লম্বায় খাটো কিন্তু খুব ভারী। পেছনের পা সুমুখের পায়ের চেয়ে সরু, থাবাগুলো ছোট। কখনও কখনও সামনের পায়ের ছাপের ওপর পেছনের পায়ের ছাপ এমনভাবে পড়ে যেন মনে হয় কোনো দু'পাওয়ালা জন্তু হেঁটে গেছে। পায়ের ছাপ ধরে বাঘকে খোঁজা যায়। শুধু পায়ের ছাপ দেখেই বাঘের সাইজ, বাঘ না বাঘিনী বলে দেওয়া যায়। সাধারণত এরা ল্যাজ দোলাতে থাকে। রেগে গেলে বা খুব খুসী হলে ল্যাজ নাড়া বন্ধ করে দেয়।

বাঘ মাংসখেকো জন্তু। শুধু মাংস হলেই হোলো, কার মাংস, তাজা না বাসী, কিছুরই ধার ধারে না। মাংস ছাড়া আর কিছুই খায় না। মাঝে-সাঝে একটু-আধটু সবুজ ঘাস খায়, তাও ওষুধ হিসেবে। বাঘ নিজের শিকার করা মাংস ছাড়া খায় না, অনেকেরই তাই ধারণা। এটা কিন্তু ভুল। যে কোনো জন্তুর শিকার-করা মাংস এরা বিনা দ্বিধায়, বিনা কৈফিয়তেই খেয়ে নেয়। পোকা থিক্‌থিকে পচা মাংস খুব ভালবাসে।

খিদে পেলে বনের যেকোনো জন্তুজানোয়ার শিকার করে খায়, কোনো বাছবিচার করে না। বাঘ শুধু বুনো কুকুরের দলকে ভীষণ ভয় করে। শেয়ালও মাঝে মাঝে এদের হয়রান করে। খাবার পাবার লোভে বাঘের পিছু নেয়। বন্যার সময় বাঘেরা ব্যাঙ, কচ্ছপ আর মাছ খেয়ে খিদে মেটায়। বাঘ বাঘেরও মাংস খায়। বাঘিনীরা তাই নিজেদের বাচ্চাদের বাঘের ধারে কাছেও ঘেঁষতে দেয় না।

অন্য জন্তুরা বাঘের শিকার খায়না, একথা কিন্তু সত্যি নয়। সুযোগ পেলে বাঘের শিকার-করা মাংস বনের আর সব জন্তুরাই খায়। তাই শিকার-করা মাংস রাখার জায়গা বাঘেরা রোজ পাল্টায়। পেট ঠেসে খেয়ে খাকী মাংস লুকিয়ে রাখে। একসঙ্গে পঁচিশ থেকে তিরিশ কিলো-গ্রাম মাংস খেতে পারে।

বাঘ শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে না। আস্তে আস্তে চুপিসাড়ে শিকারের কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ দৌড়ে লাফ মারে। প্রথমে শিকারের ঘাড় মটকায় কিংবা টুঁটি চেপে ধরে। এদের খাওয়া খুব পরিষ্কার। অন্য কোনো জন্তুর এতো পরিষ্কার নয়। পায়ের দিক থেকে খেতে সুরু করে। প্রথমে উরুর মাংস, তারপর আস্তে আস্তে সারা শরীরের মাংস, চামড়া, হাড় ও মাথার চুল চিবিয়ে খায়। নাড়িভুঁড়ি শুধু খায় না, সন্তর্পণে আলাদা করে সরিয়ে রাখে।

এরা একলা শিকার করে। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা শিকার করার এলাকা আছে। খিদে পেলেই তবে শিকার করে। সাধারণত মাসে তিন-চার বারের বেশি এদের শিকার মেলে না।

বাঘ মানুষকে ভয় করে। মানুষের উচ্চতা, পোষাক-আষাক আর দুটো পা দেখে। তবুও এরা মানুষ মেরে খায়। বুড়ো, অসুস্থ, দুর্বল বা আহত বাঘের শিকার করতে খুবই কষ্ট হয়। খিদের সময় সামনে মানুষ পড়লে এরা মানুষখেকো হয়ে পড়ে। মানুষখেকো বাঘ গরু-বাছুর ছেড়ে দিয়ে রাখালেরই পিছু নেয়। মানুষখেকো বাঘিনীর বাচ্চারাও মানুষের মাংসের স্বাদ পেয়ে যায়। এরা কিন্তু মানুষের মাথা খায় না। কুকুরের মতই বাঘ পাগল হয়ে যায়। পাগল হবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অনেককে আক্রমণ করে।

মানুষখেকো বাঘ মানুষ চেনে, মানুষের চালচলনও বুঝতে পারে। অসাবধানী পথিককে হঠাৎ কি করে আক্রমণ করতে হয়, চুপি চুপি বাড়ীতে

বছর অন্তর বাচ্চা দেয়। এরাই বাচ্চাদের শিকার খুঁজতে আর শিকার করতে শেখায়। পুরোপুরি বড় হতে বাচ্চাদের পাঁচ বছর লাগে।

শিকারের মধ্যে বাঘ-শিকার সত্যিই খুব বিপদজনক। আগেকার দিনে তরোয়াল, বর্শা আর তীর দিয়ে বাঘ শিকার করা হোতো। বাঘকে ফাঁদে ফেলার জন্যে গ্রামবাসীরা যারা জঙ্গলে বাস করতো তারা প্রায়ই গর্ত খুঁড়ে গর্তের মুখ ঘাস পাতা দিয়ে ঢেকে রেখে দিতো। বাঘ ধরার অনেক রকম ফাঁদ ছিলো। কখনও কখনও ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাঘকে খাঁচায় পুরে বর্শা দিয়ে মারা হোতো। কোনো কোনো জায়গায় আবার বাঘেদের প্রিয় খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে টোপ ফেলা হোতো। সুন্দর বনে মাচা বাঁধার মত বড় গাছ নেই। শিকারীরা তাই নিজেদের বাঁচাতে লোহার শক্ত গরাদ দেওয়া খাঁচার মধ্যে বসে গুলি ছোঁড়ে।

রাইফেল ও বন্দুকের পসারের সঙ্গে সঙ্গে বাঘ শিকারের রীতিও পালটে গেছে। বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেলে শিকারীরা সাধারণত একটা বছর খানেকের মোষের বাচ্চাকে সন্ধ্যেবেলা একটা গাছ কিংবা একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিয়ে আসেন। মোষের গলায় দড়ি না বেঁধে তার পা দুটো শক্ত করে বেঁধে দেন।

সন্ধ্যেবেলা বাঘ এদিকে এসে পড়লে মোষটাকে মেরে টানতে টানতে আশেপাশের ঝোপঝাড়ে নিয়ে যায়। বেশ ঘন ঝোপঝাড় হলে বাঘও শিকারের সঙ্গে সেখানেই লুকিয়ে থাকে। পরের দিন হাঁকোয়া দিয়ে অর্থাৎ ঢাক ঢোল পিঠিয়ে তাড়া দিয়ে বাঘকে সেখান থেকে বাইরে আনা হয়। মাচায় শিকারীরা তো বন্দুক হাতে তৈরী। যেই বাঘ বন্দুকের রেঞ্জ বা পাল্লার মধ্যে এসে পড়ে, অমনি শিকারীরা গুলি ছোঁড়েন।

হাতীর পিঠে চড়ে বাঘ খোঁজাই সুবিধে। এর জন্যে বিশেষভাবে শেখানো-পড়ানো হাতীর দরকার। মাচায় বসে শিকার করার চেয়ে চারিদিক ঢাকা গভীর গর্তের ভেতর বসে শিকার করা অনেক শিকারী পছন্দ করেন। লুকিয়ে-থাকা বাঘকে তার জায়গা থেকে তাড়িয়ে মাচার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এই তাড়ানোর কাজে অনেক সময় হাতীকেও লাগানো হয়।

সাদা জিনিষে বাঘ ভয় পায়। তাই বাঘের চলার পথ রোধ করতে বা তাকে ভিন্ন পথে নিয়ে যাবার জন্যে তার যাতায়াতের পথে সাদা চাদর টাঙ্গিয়ে কিংবা সাদা কাগজ বিছিয়ে দেওয়া হয়। বাঘ আর এদিক মাড়ায় না। যে সব বাঘ এই ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তারা বিপদ বুঝে জঙ্গলে ফিরে যায়। শিকারীদের কেউ কেউ মাচার চেয়ে হাতীর পিঠে চড়ে শিকার করতে ভালোবাসেন। হাতী দিয়ে বাঘকে তাড়িয়ে আনা হয়। হাতীর পিঠই হয় মাচা। এর একটা সুবিধে। মাচা সরানো যায় না, কিন্তু হাতীর পিঠে চড়ে খুসী মত এগোনো-পেছোনো যায়।

নেপালের তরাইতে শিকারের সময় চার পাঁচশো হাতী দিয়ে বাঘকে গোল করে ঘিরে ফেলা হয়। এটাই বাঘ শিকারের 'রিঙ ওয়ে' পদ্ধতি বা গোলাকারে বাঘ ধরার প্রণালী।

বাঘ শিকারের সময় খুব সতর্ক থাকতে হয়। বাঘ তাড়ানো সুরু হলেই বনের আর সব জন্তুরা ডেরা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। বাঘও এদের পিছু নেয়।

একটি পর্যবেক্ষণ গৃহ

বাঘ যখন ছুটে বেড়ায় তখন গুলি করা খুবই বিপদজনক। আহত বাঘ শিকারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মেরে ফেলতে পারে। গুলি বিঁধলেই বাঘ গর্জে ওঠে। হাঁকোয়ায় সাধারণত একটা বাঘই বেরোয়, কখনো বা একটার বেশী।

বেশির ভাগ মাচাই চার মিটার বা আরো একটু উঁচুতে বাধা হয়। মাচার চারদিক ভালোভাবে ঢেকে দেওয়া হয়।

পায়ে হেঁটে বাঘ শিকার করা আরও শক্ত ও মারাত্মক।

স্বভাবতই বাঘেরা শান্তিপ্রিয়। মানুষ বা অন্যান্য জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে খামাখা ঝগড়া বা ঝামেলা বাধাতে চায় না। একবার আহত হলে আর দেখতে হবে না। ঝোপেঝাড়ে তখন ঘাপটি মেরে বসে থাকে। আচমকা শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আহত বাঘ হাতীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে বা মাচা বেয়ে ওপরে উঠতে এতটকুও দ্বিধা করে না।

একবার এক ইঞ্জিনিয়ার সাহেব হাতীর পিঠে চেপে একটা আহত বাঘের খোঁজে বেরোন। বাঘটা হঠাৎ হাতীর ওপর লাফিয়ে পড়ে। টাল সামলাতে না পেরে হাতী হোঁচট খেলো। সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবও পড়ে গেলেন। পড়বি তো পড় একেবারে বাঘের পিঠে। হাতীটা ভয় পেয়ে দে ছুট। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কাঁধটা কামড়ে ধরে বাঘ তাঁকে হেঁচড়াতে হঁচড়াতে জঙ্গলের ভেতরে নিয়ে গেল। বাঘটা মাঝে মাঝে শিকার ছেড়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কিন্তু নড়ার জো ছিলো না নড়লেই বাঘের নখের আঁচড়, ঠিক বেড়াল যেমনভাবে ইঁদুরকে আঁচড়ায়। গভীর জঙ্গলে পৌঁছে বাঘ সাহেবের গা ঘেঁষে বসলো। এতো কাছে যে বাঘের হৃৎপিণ্ডের ধকধকানিও সাহেব শুনতে পাচ্ছিলেন। নির্ঘাত মৃত্যু জেনে সাহেব সকল যন্ত্রণা ভুলে গেলেন। কোমরে বাঁধা পিস্তলের কথা দুএকবার মনে পড়লো। কিন্তু বাঘের থাবার কথা ভেবে ভয়ে হাত পা পেটে সিঁধিয়ে গেল। অনেক কষ্টে সাহসে ভর করে অতি সন্তর্পণে কোমর

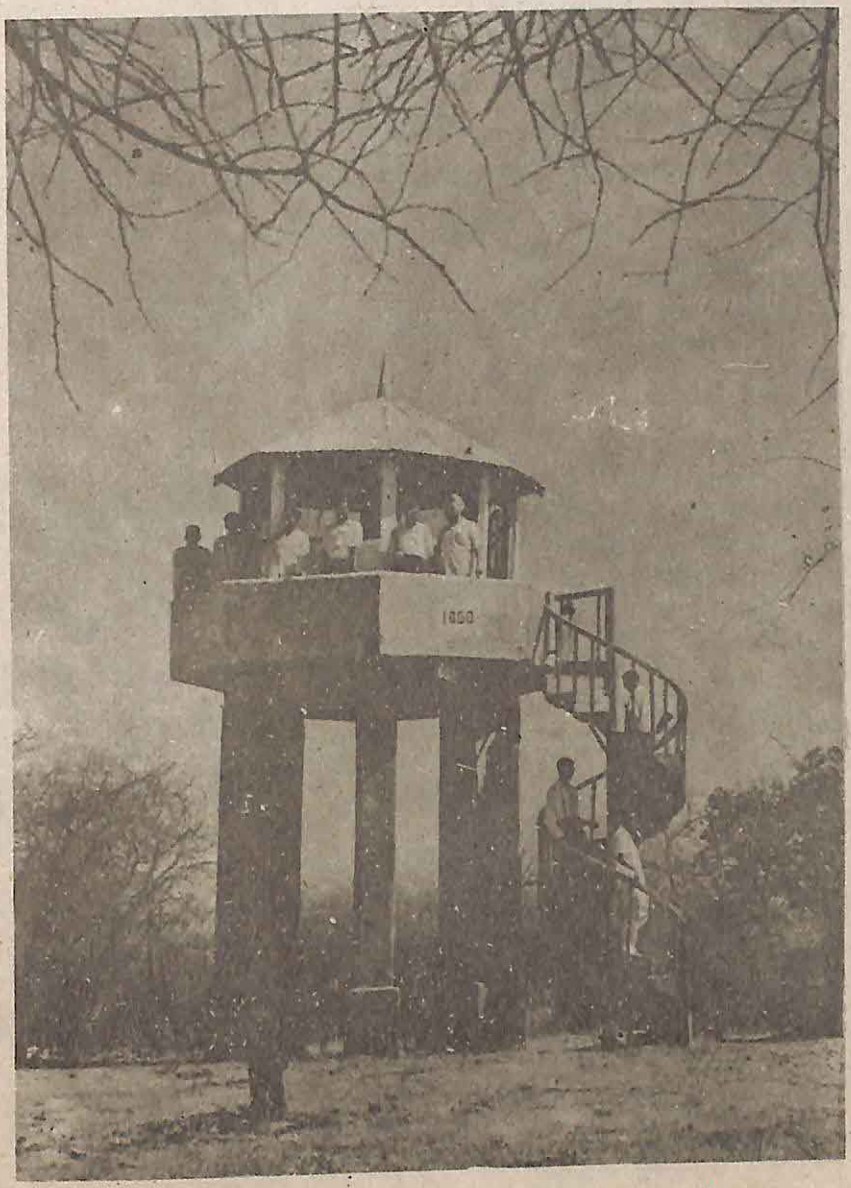

গীর জঙ্গলের পর্যবেক্ষণ গৃহ

15067

থেকে পিস্তলটা টেনে বার করলেন। বাঘ তখন রেগে গরগর করছে, মুখটা তার অন্য দিকে ফেরানো। সুযোগ বুঝে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বাঘের বুক লক্ষ্য করে দুবার গুলি ছুঁড়লেন। বাঘের হুঙ্কার শোনার পরই সাহেব জ্ঞান হারান। জ্ঞান ফিরলো একেবারে হাসপাতালে।

হাতীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে কিংবা কোনো মানুষকে ধরে ফেলেছে এমন আহত বাঘকে লক্ষ্য করে কখনও গুলি ছুঁড়তে নেই। বাঘ এতো তাড়াতাড়ি নড়াচড়া করে যে গুলি ফসকে গিয়ে হয় হাতীকে নয় মানুষকে জখম করতে পারে। এই রকম বিপদের সময় গুলির ফাঁকা আওয়াজে বাঘকে ভয় দেখাতে হয়। গুলির শব্দে বাঘ ভীষণ ভয় পায়।

কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। বাঘের হাতে জখম হোলে বাঁচা

সামনের পাতায় × চিহ্নিত জায়গায় বাঘ লুকিয়েছিলো

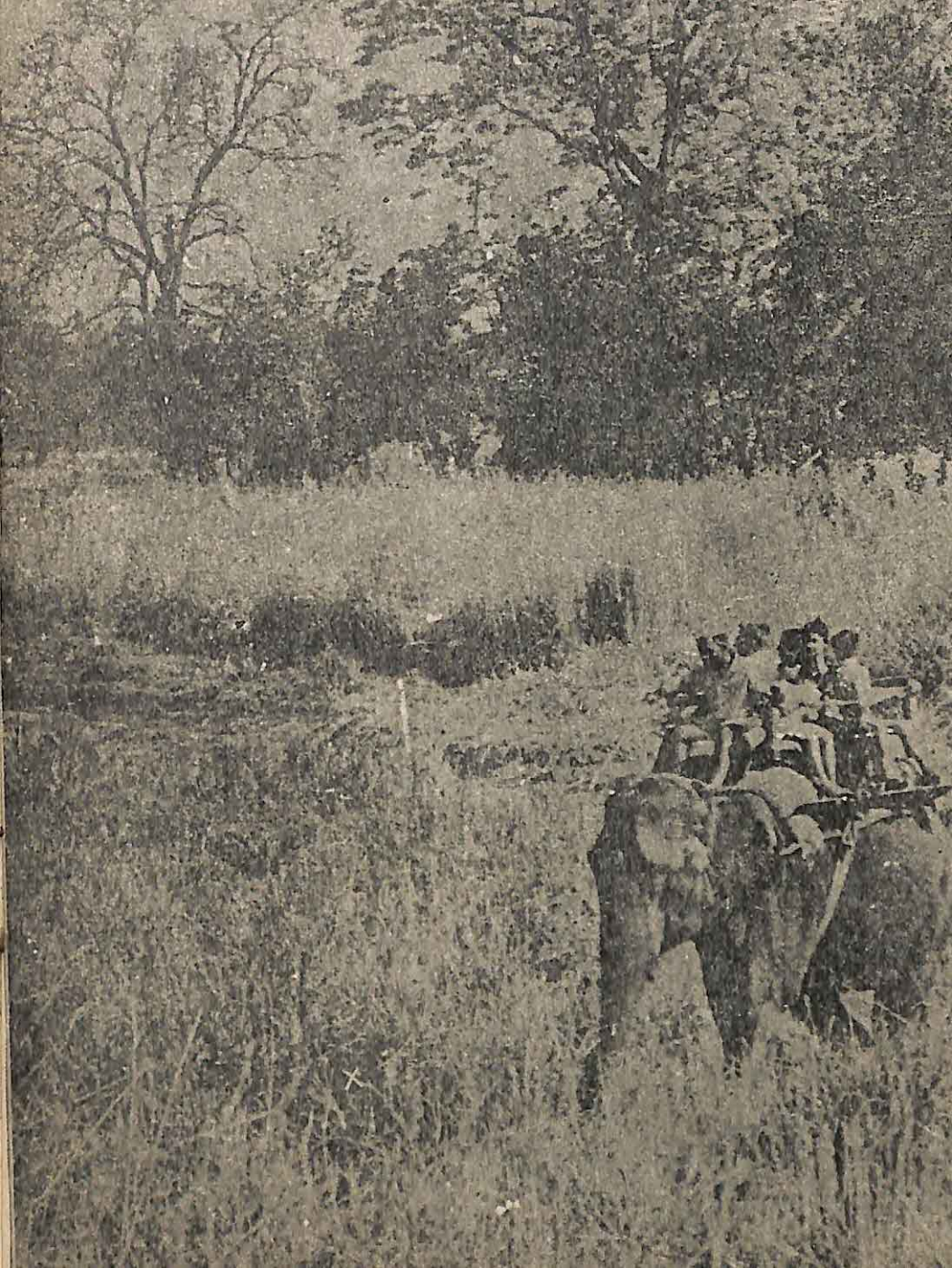

খুবই শক্ত। আঁচড়গুলো ঘা হয়ে পচতে আরম্ভ করে। গুলি খেয়ে বাঘ সব সময় কিন্তু মরে না, কখনও কখনও শুধু অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে। গুলি করে বাঘের কাছে এগিয়ে গিয়ে তাই অনেক শিকারীই প্রাণ হারিয়েছে।

অনেক সময় আহত বাঘ লোকবসতির মধ্যেও এসে পড়ে। একবার কুর্নুলে এক বাঘিনী সন্ধ্যেবেলায় মিষ্টার ভেঙ্কটরমণ আইয়ারের বাংলোর একটা ঘরের টেবিলের তলায় এসে বসেছিলো। মিষ্টার আইয়ার চেয়ার টেনে নিয়ে কাজে বসলেন। বসবার সময় বাঘিনীর গায়ে তাঁর পা ঠেকে। ভীষণ ভয় পেয়ে চিৎকার করতে করতে তিনি বাইরে বেরিয়ে আসেন। প্রথমে তাঁর কথা কেউ বিশ্বাসই করল না। বাঘিনীকে মারা হোলো। গায়ের ছাল ছাড়িয়ে দেখা গেল তার গায়ে ক্ষত ছিলো!

পাথরের মূর্তির মত মানুষ স্থির হয়ে থাকলে বাঘ আক্রমণ করে না। নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকলেও মানুষকে খুঁজে বার করতে পারে না।

হাতী কিংবা উটের পিঠে চড়ে বেড়ালে অথবা গাড়ী চালিয়ে গেলে বাঘ ঘাবড়ে যায়। অন্য জন্তুদের মত বাঘও মানুষকে ভয় পায়।

সাহারানপুরের কাছে একবার আমি ও আমার পেশাদার শিকারী দিলীপ সিং একটা উঁচু টিপির ওপর বাঘের অপেক্ষায় বসে। নীচে নালার ধারে বাঘের পায়ের ছাপ লক্ষ্য করে আন্দাজ করলাম বাঘ ঐ পথেই ফিরবে। কিন্তু জানো, কি দেখলাম? ঠিক আমাদের মাথার ওপর আর একটা উঁচু টিপিতে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বাঘটা দাঁড়িয়ে আছে। তার ল্যাজটা দিলীপ সিংয়ের পাগড়ী ছুঁয়ে এধার-ওধার দুলছে। একটু পরেই বাঘটা অন্য দিকে ছুট দিলো। বাঘের এই দু'মিনিটের সঙ্গ অন্তহীন মনে হয়েছিলো।

বাঘের চামড়া, গোঁফ, দাঁত, নখ, মাংস এমন কি চর্বিও কাজে লাগে। অনেকেরই বিশ্বাস বাঘের মাংস খেলে বাঘের মতই শক্তিশালী আর সাহসী হওয়া যায়। বাঘের চর্বি বাতের খুব ভালো ওষুধ। বাঘের নখ সোনায়

কিংবা রূপোয় বাঁধিয়ে তাবিজের মত ব্যবহার হয়। বাঘের কাঁধের হাড় ইংরেজরা যাকে 'লাকী বোন' বলে, সেটাও সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে অনেকে পরে। বাঘের ছাল খুব টেঁকসই, কার্পেটের মত ব্যবহার করা হয়। শোনা যায় বাঘিনীর দুধে চোখের অনেক রকম রোগও সারে।

আমাদের দেশে বাঘের সংখ্যা এখন খুবই কম। যাতে একেবারে নিশ্চিহ্ন না হয়ে যায় তার জন্যে অনেক রাজ্যে সরকারের তরফ থেকে বাঘ-শিকার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যেভাবে জঙ্গল সব কেটে সাফ করা হচ্ছে এবং বাঘের আহার্য জন্তুজানোয়ারদের যে হারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হচ্ছে, তা যদি চলতে থাকে তাহলে আমাদের দেশে বাঘ আর থাকবে কিনা সন্দেহ।

সিংহ

সিংহকে কিন্তু বাঘের মত দেখতে নয়, একেবারে আলাদা। সিংহ আকারে ছোট, রঙ হাল্কা হলুদে, গায়ে কোনো ডোরাকাটা নেই। ল্যাজ ছোট, লোমও প্রচুর। সিংহের ঘাড়ে নরম ঝাঁকড়া কেশর, সিংহীর কিন্তু এ সবের বালাই নেই। লম্বায় এরা আড়াই মিটার থেকে তিন মিটার, উচ্চতা এক মিটারের কিছু বেশি। ওজন সাধারণত একশো আশী থেকে দুশো পঁচিশ কিলোগ্রাম। সিংহ বাঘের মত অত ভয়ঙ্কর নয়।

আমাদের দেশে সিংহকে অনেক নামেই ডাকা হয়। সিংহ, কেশরী, কেহরী, হরি, বব্বর, শের ইত্যাদি। অনেক কাল আগে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের সমতল ভূমিতে সিংহ পাওয়া যেতো। তাই লোকেরাও চিনতো। বেদ, শাস্ত্র ও পৌরাণিক গ্রন্থে সিংহের কথার উল্লেখ আছে। সিংহ দুর্গা ঠাকুরের বাহন। সাহস ও বীরত্বের প্রতীক। রাজপুত ও শিখেরা নিজেদের নামের শেষে এই সিংহ কথাটি জুড়ে দেয়। সিংহ আমাদের জাতীয় পশু।

সম্রাট অশোকের চারটি সিংহওয়ালা স্তম্ভটি আমাদের রাষ্ট্রীয় চিহ্ন, একথা তোমরা জানো। এরই তলায় ভারতের আদর্শ 'সত্যমেব জয়তে' অর্থাৎ সত্যেরই জয় কথাটি খোদাই করা আছে।

আমাদের দেশে সিংহ নেই বললেই চলে। দু'চারটে যা আছে তা জুনাগড়ের গীর জঙ্গলে। সিংহ-শিকার আমাদের দেশে একরকম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আগেকার দিনেও শুধু রাজামহারাজাদেরই সিংহ শিকার করতে দেওয়া হোতো।

একসময় আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপেই সিংহ পাওয়া যেত। বন্দুক ও রাইফেল আবিষ্কার হবার পর গত দুশো বছরে

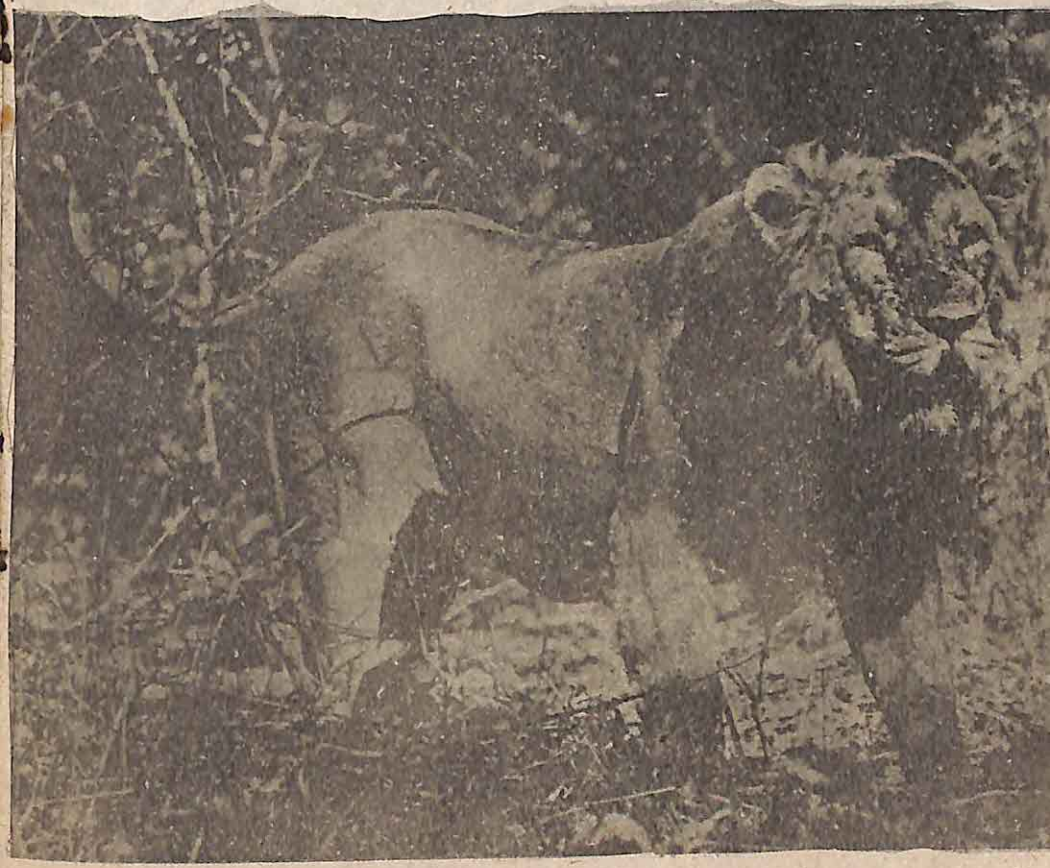

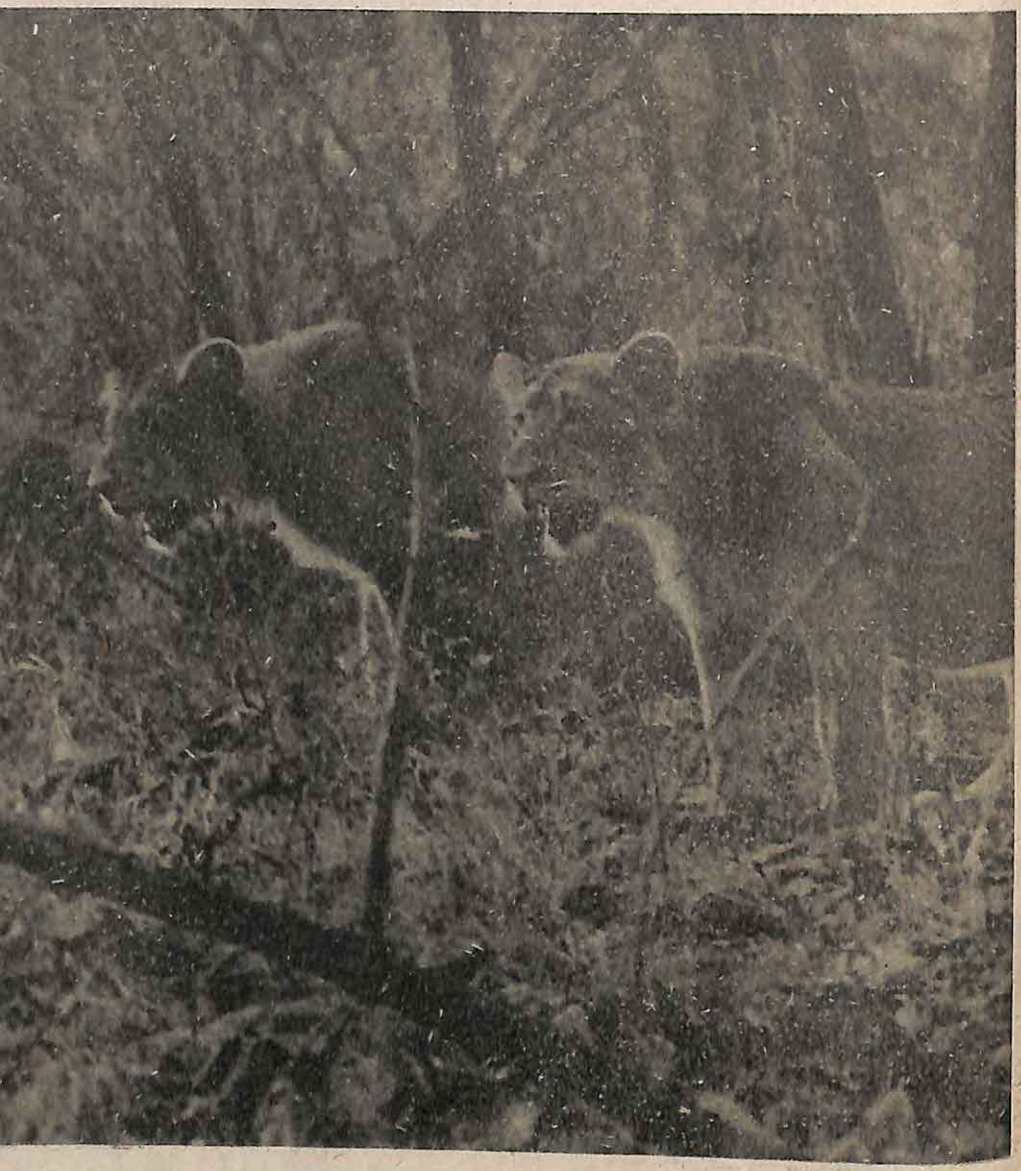

এদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসছে। বাঘ যেমন উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে ভারতে এসেছিলো, সিংহ তেমনি দক্ষিণ-পশ্চিম পথে। আফগানিস্থানের পথে না এসে এরা এসেছে সিরিয়া, ইরাণ, ইরাক, বেলুচিস্থান ও সিন্ধুদেশ দিয়ে। সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সৈন্যরা গ্রীসে যখন এই পথ দিয়ে ফিরছিলো তখন সিংহরা এদের খুব হয়রান করেছিলো। বাঘের মত সিংহও সিংহলে পৌছোতে পারিনি।

সিংহ খোলা সমতল ভূমিতে বাস করে। ভারতের বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে—যেখানে কালো হরিণ, নীল গাই, মায়া হরিণ বা কাকার ও চার শিংওয়ালা হরিণ, সিংহকেও সেখানে পাওয়া যেতো। তাই আমাদের দেশে সিংহ বাইরে থেকে এসেছে কিনা, বলা মুশকিল। সঠিকভাবে এইটুকু শুধু বলা যায় যে এদের জন্ম—হয় আফ্রিকায় নয় ভারতের সমতলভূমিতে।

সিংহরা বাঘের মত লুকিয়ে থাকে না। নিজেদের জঙ্গলের রাজা ঠাউরে বীরের মত ঘুরে বেড়ায়। একা থাকতেও ভালোবাসে না, সপরিবারে ঘোরে। সিংহ আর সিংহী প্রায়ই একসঙ্গে শিকার করে। একজন শিকারের জন্যে ওত পেতে বসে থকে আর অন্যজন শিকারকে তাড়িয়ে নিয়ে আসে। অন্ধকারে

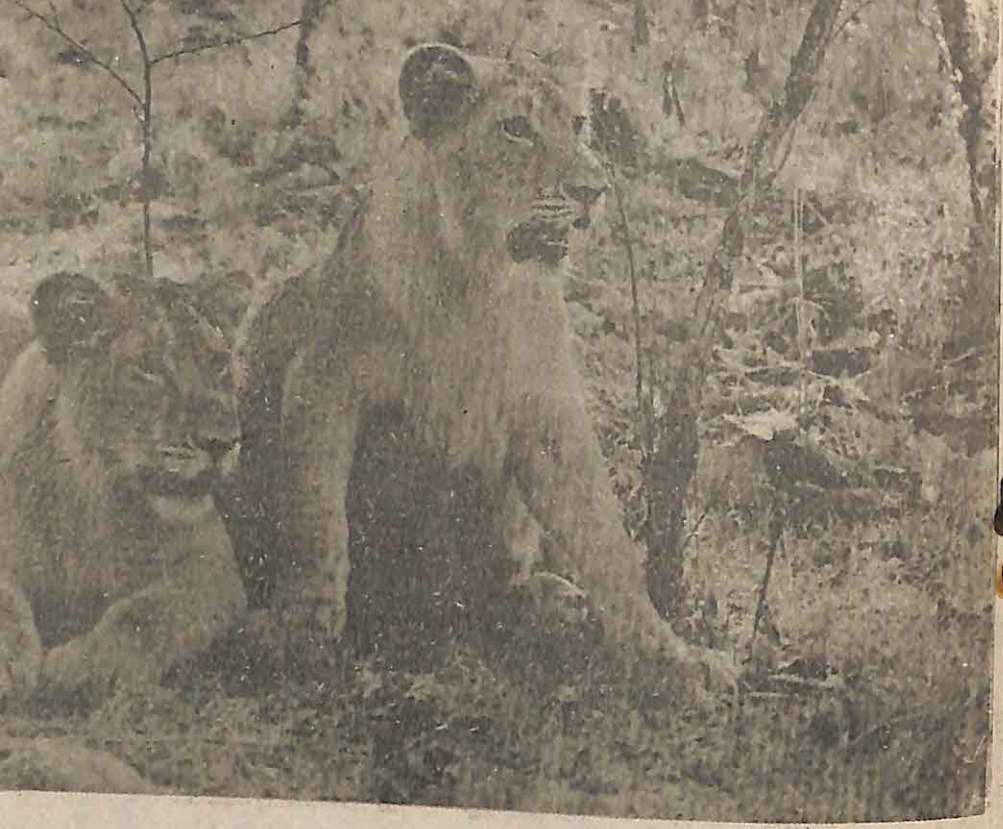

তাকিয়ে ল্যাজ নাড়তে থাকে। ছুটে পালালে নির্ঘাত মৃত্যু ভেবে পাথরের মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। মুখটা আমার ক্যামেরায় ঢাকা ছিলো। ছবি তোলার জন্যে আমি তখন সিংহকে ক্যামেরায় ধরার চেষ্টা করছিলাম। মুখের ওপর ক্যামেরাটা থাকায় সিংহ একটু হতভম্ব হয়ে গেল। ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকায় ভালো করে দেখার জন্যে সিংহ ল্যাজ নাড়তে নাড়তে

আরও কাছে এগিয়ে এলো। অজান্তেই বোধ হয় আমি একটু নড়েছিলাম। হঠাৎ দেখি তার ল্যাজ নাড়া বন্ধ হয়ে গেছে। আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ঠিক আগেই, আমার যে বন্ধু জীপে বসেছিলো চিৎকার করে ওঠে, 'পালাও, সিংহ তোমার ঘাড়ে এসে পড়েছে।'

বনের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দিয়ে বন্ধুর ডাক প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। আমায় ছেড়ে সিংহ জীপের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। গুলির ফাঁকা

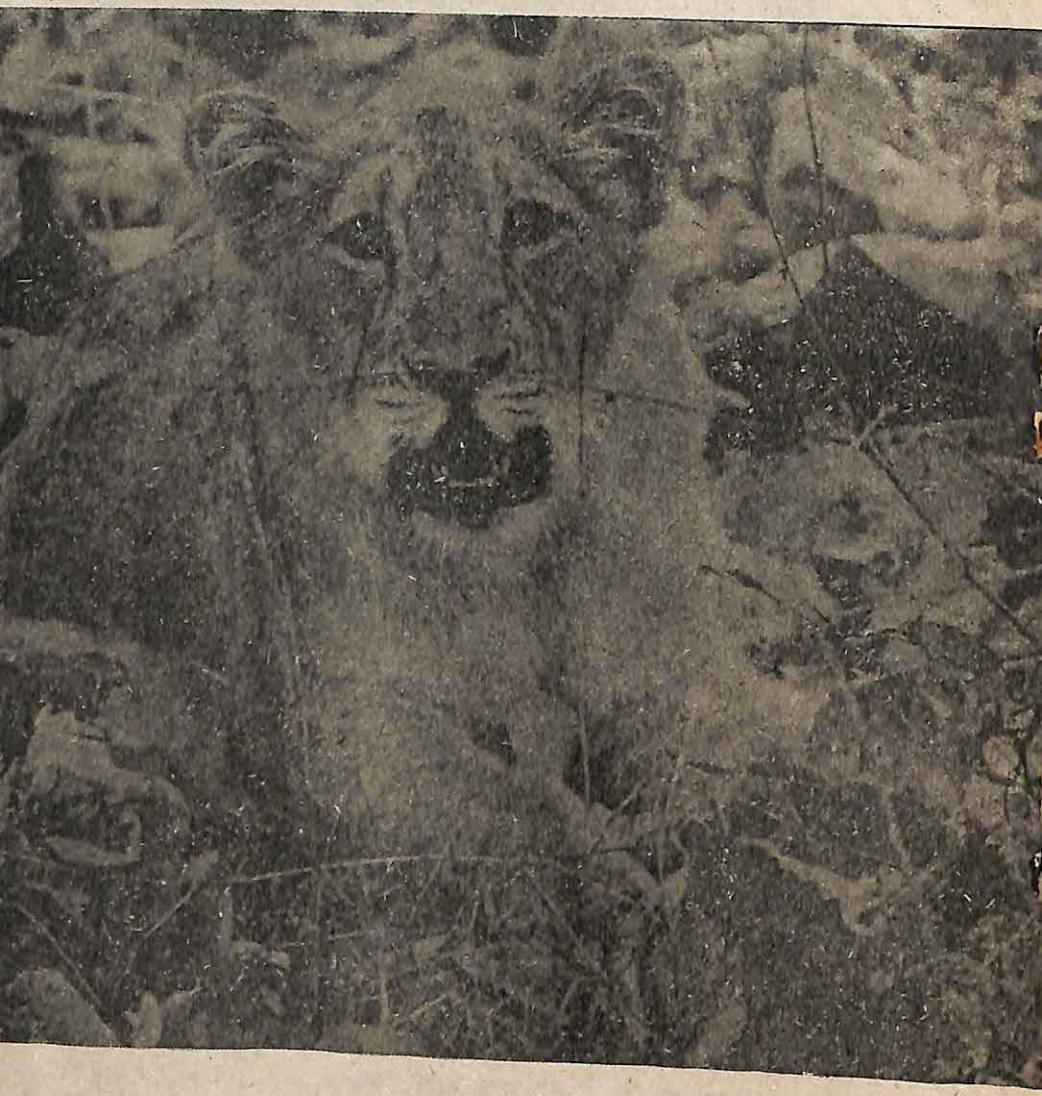

আওয়াজে ভয় দেখিয়ে জীপের লোকেরা সিংহকে তাড়াল। ভয়ে আমি ওখানেই বসে পড়ি। বেশ কিছুক্ষণ বাদে টলতে টলতে জীপের কাছে এসে পৌছোই। এই গল্প বলার জন্যে বোধ হয় সিংহ সেদিন আমায় রেহাই দিয়েছিলো। সাধারণত সিংহের সঙ্গে দু'তিনটে সিংহী থাকে। তিন থেকে সাড়ে তিন মাস সিংহীরা পেটে বাচ্চা ধরে। এক সঙ্গে গোটা চারেক বাচ্চা জন্মায়, কখনও কখনও ছটা। এরা পঁচিশ থেকে তিরিশ বছর বাঁচে। জঙ্গলে বাঘ ও সিংহ একসঙ্গে বাস করতে পারে না, এটাই সবায়ের বিশ্বাস। বাঘের জঙ্গলে সিংহ ছেড়ে দিলে, দু'দলে মারামারি কাটাকাটি করে শেষ হয়ে যাবে, এ ধারণাও ভুল। বাঘ কারুর সঙ্গে ঝগড়া করে না। একসময় আলোয়ারের মহারাজা চারবার বাঘ-সিংহের লড়ায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। বাঘ লড়তে নারাজ। জোর করায় ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে গেল।

আমাদের দেশে সিংহের বসতি বাড়াবার অনেক চেষ্টা হয়েছে। বিদেশ থেকে সিংহ এনে সমতল তৃণভূমিতে ছাড়া হয়েছে। তৃণভূমি ছোটো, জন্তু-জানোয়ারও এতো নেই যা খেয়ে সিংহ বেঁচে থাকতে পারে। ফলে এরা তৃণভূমি ছেড়ে গরু-বাছুর ও মানুষকে আক্রমণ করতে সুরু করে দেয়।

গোয়ালিয়ারের মহারাজা সিন্ধিয়া একবার আবিসিনিয়া থেকে সিংহের বাচ্চা আনান। কিছুদিন নিজের কাছে রেখে বড় করেন। তারপর গোয়ালিয়র ও শিবপুরীর মধ্যের মোহনা জঙ্গলে এদের ছেড়ে দেন। প্রথম কিছুদিন সিংহেরা বুনো জন্তুজানোয়ার খেয়ে রইল। তারপর গরু-বাছুর ধরে নিয়ে খেতে লাগলো। শেষবেশ মানুষ শিকার করতে শুরু করে দিল। এদের আবার ধরে নিয়ে আসা হোল। শ্যেওপুর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। এখানে কিছুদিন থাকার পর আবার মানুষ খেতে সুরু করে। উপায় না

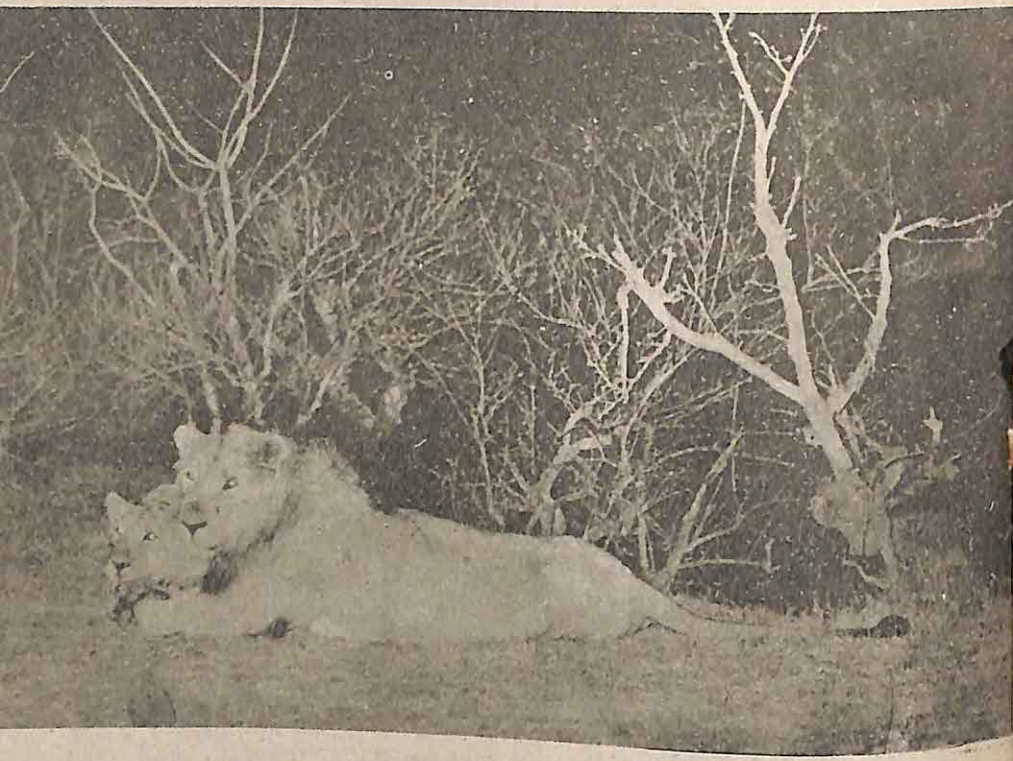

দেখে এদের মেরে ফেলা হয়। অন্য পরিবেশে সিংহ সহজে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না।

সম্প্রতি জুনাগড়ের জঙ্গল থেকে একটা সিংহ ও দুটো সিংহীকে ধরে এনে উত্তর প্রদেশের চন্দ্রপ্রভা নদীর ধারে চাকিয়া জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আশঙ্কা হয় এরাও একদিন মানুষ খেতে আরম্ভ করবে। আর তা করলে এদের মেরে ফেলা ছাড়া উপায় নেই।

চিতা বা গুলবাঘ

চিতা বাঘের আর এক নাম গুলবাঘ। বেড়াল পরিবারেরই এরা। খুব চালাক, ধূর্ত আর বিশ্বাসঘাতক। বুন্দেলখণ্ডের লোকেরা বলে 'তেন্দুয়া'। গায়ের ছোপগুলো ফুলের মত দেখায় বলে এদের 'গুলদার' বা 'গুলবাঘ' বলা হয়।

চিতা প্রায় সব দেশেই পাওয়া যায়। আফ্রিকায় বাঘ মেলে না, কিন্তু চিতার ছড়াছড়ি। 'জাগুয়ার' বলে এক জাতের বাঘ আমেরিকার প্রায় সব জায়গাতেই পাওয়া যায়, দেখতে ঠিক চিতার মত। সাইবেরিয়ার উত্তরাঞ্চল ছাড়া এশিয়ার প্রায় সব জায়গায় এদের দেখা যায়। আন্দামানের দ্বীপগুলোয়, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, মাদাগাস্কার ও সাহারার মরুভূমিতে কিন্তু চিতা মেলে না। আমাদের দেশে প্রায় সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। হিমালয়ের দু'হাজার থেকে দু'হাজার আটশো মিটার উঁচু জায়গাতেও এদের দেখা মেলে। যেখানেই থাকুক, বসবার সময় এরাও সবসময় বাঘের মত ঠিক উঁচু জায়গাটি বেছে নেয়।

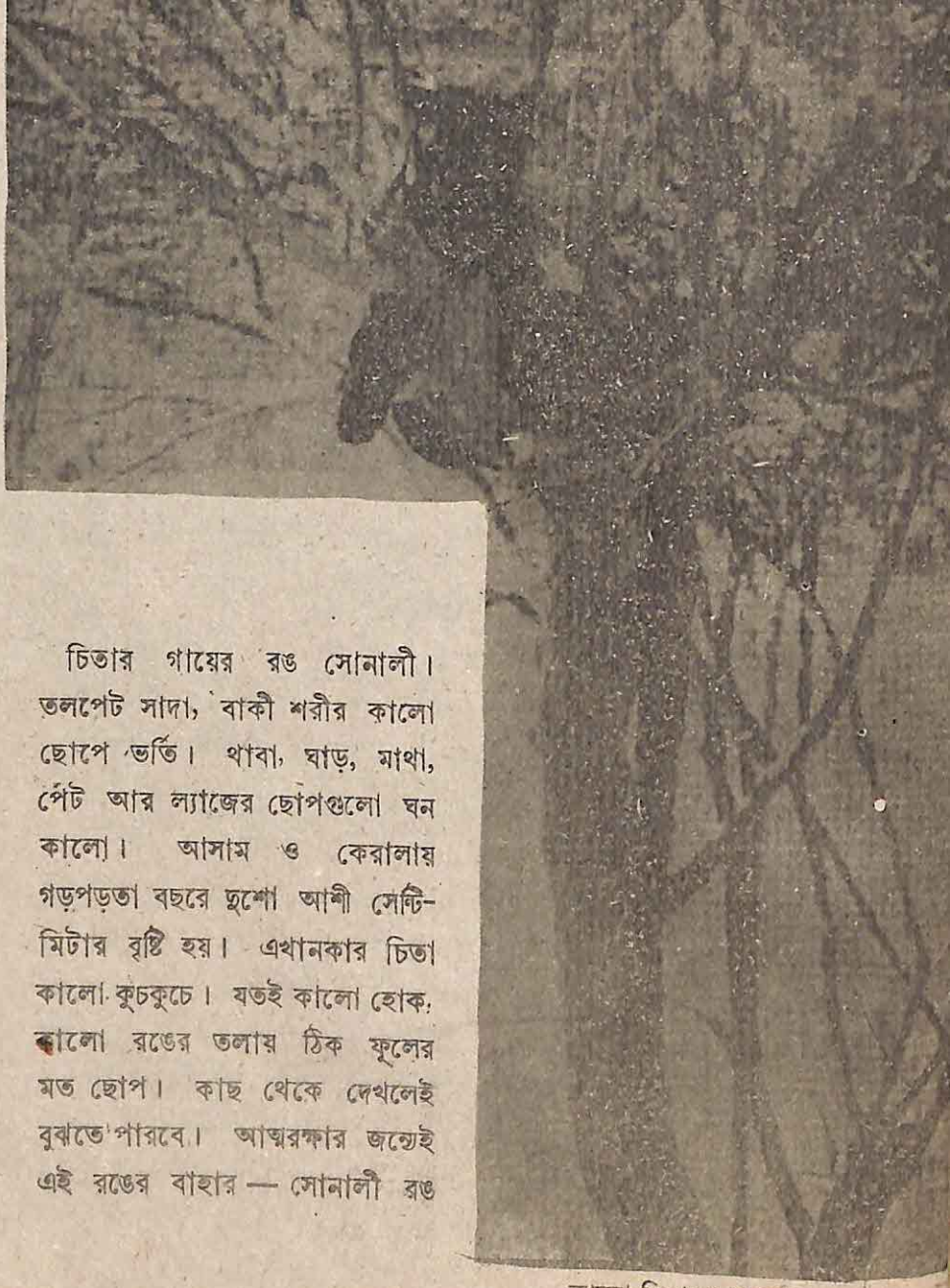

চিতার গায়ের রঙ সোনালী। তলপেট সাদা, বাকী শরীর কালো ছোপে ভর্তি। থাবা, ঘাড়, মাথা, পেট আর ল্যাজের ছোপগুলো ঘন কালো। আসাম ও কেরালায় গড়পড়তা বছরে দুশো আশী সেন্টি-মিটার বৃষ্টি হয়। এখানকার চিতা কালো কুচকুচে। যতই কালো হোক, কালো রঙের তলায় ঠিক ফুলের মত ছোপ। কাছ থেকে দেখলেই বুঝতে পারবে। আত্মরক্ষার জন্যেই এই রঙের বাহার — সোনালী রঙ

কালো চিতা বা গুলবাঘ

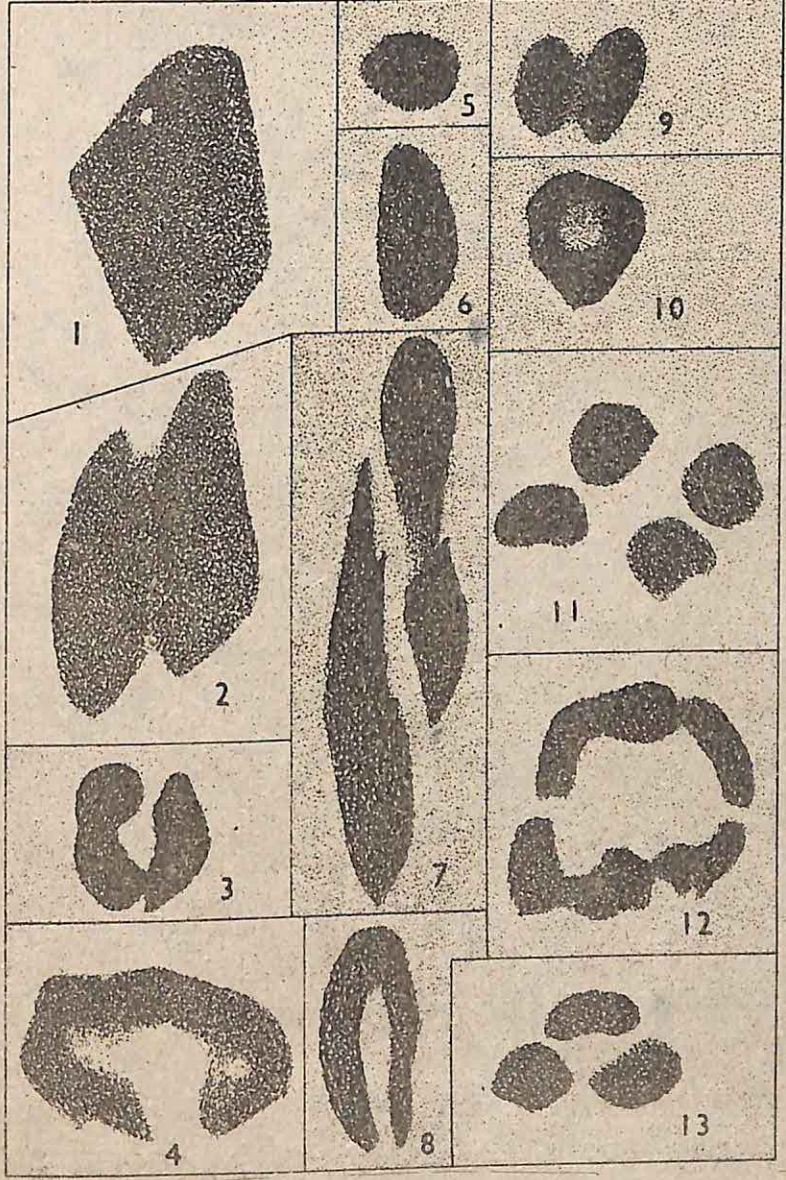

গুলবাঘ বা চিতার গায়ের ছোপ

১ ও ২ তলপেটের (পেটের ওপরে) ; ৩ পিঠের ; ৪ ঘাড়ের (২ দিকে) ; ৫ মাথার ওপরে ; ৬ ঘাড়ের শিরদাঁড়ার ; ৭ পিঠের শিরদাঁড়ার মধ্যিখানে ; ৮ ল্যাজের ডগার ; ৯ ও ১০ কাঁধের কাছে শিরদাঁড়ার ঠিক নীচে ; ১১ পাঁজরার ; ১২ তলপেটের ২ দিকে ; ১৩ কাঁধের।

বি : দ্র :— আসল ছোপের দৈর্ঘ ৪ সেন্টিমিটার

আর কালো ছোপ। জঙ্গলের ধূপছায়ায় এদের সোনালী রঙ ও কালো ছোপের ওপর যখন গাছের পাতার ছায়া পড়ে তখন কে বলবে এরা ঘাপটি মেরে বসে আছে। এতো সুন্দর দেখতে যে গায়ে হাত বুলোতে ইচ্ছে করে।

অনেকটা পোষা বিড়ালের মত। ছিপছিপে গড়ন, নিঃসাড়ে চলাফেরা করে। তীক্ষ্ণ কান, খরখরে জিভ। ছোটায় জাতভাইদের হার মানায়। আশী

রাগে
গজরাচ্ছে

সেন্টিমিটার উঁচু, ল্যাজের গোড়া থেকে নাকের ডগা অবাধ লম্বায় আড়াই মিটার। শুধু ল্যাজটাই পঁচাত্তর সেন্টিমিটার। খুব বেশি করে হোলে ওজনে একানব্বই কিলোগ্রাম।

চিতা বাঘিনীরা আকারে ছোট, ওজনও কম। এক সঙ্গে এরা তিনটে থেকে চারটে বাচ্চা দেয়। চিড়িয়াখানায় দেখা গেছে এরা তিন মাস পেটে বাচ্চা ধরে। জন্ম থেকে কুড়ি দিন বাচ্চাদের চোখ খোলে না। চিতা বাঘও কখনও কখনও বাচ্চাদের পালতে সাহায্য করে। বাচ্চাদের নির্জন জায়গায় রেখে দেয়। কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না। বাচ্চাদের ঘাড়ের চামড়া মুখে ধরে বাঘিনীরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়।

এদের থাবা খুব মাংসল। সামনের পায়ে পাঁচটা করে নখ, পেছনের পায়ে চারটে। হাঁটার সময় নখগুলো থাবার মধ্যে লুকোনো থাকে। সবশুদ্ধ আঠারোটা নখ ঠিক যেন আঠারোটা শানালো ছুরি। এদের খপ্পরে কোনো জন্তু-জানোয়ার পড়লে তার রক্ষে নেই। গাছের ছালে ঘষে বলে নখ খুব ধারালো। বেড়ালের মত তেরচা চোখ নয়, গোল কটা চোখ। টর্চের আলোয় চোখ যেন আগুনের মত জ্বলে। জোরালো আলোয় ভয় পায়। সূর্যাস্তের পর শিকারে বেরোয়, বাঘের চেয়ে ঘণ্টাখানেক আগে। বাঘ বা সিংহের মত গর্জন করে না। শূয়োরের মত ঘেঁ্যাৎঘেঁ্যাৎ করে। করাত দিয়ে কাঠ কাটার মত 'ঘেঁ্যাৎঘঁ্যাৎ' আওয়াজ। চিতা বাঘকে ডাকবার সময়ও বাঘিনীরা এইরকম আওয়াজ করে। হাঁচি দিয়ে এরা রাগ দেখায়। বাচ্চাদের ধমকানোর সময় সাপের মত ফোঁস করে ওঠে।

বেড়ালের মত অনায়াসেই এরা গাছে কিংবা বাড়ীর ছাদে চড়তে পারে। বেশির ভাগ সময়ই শিকার মেরে গাছের ডালে লুকিয়ে রাখে। জলে

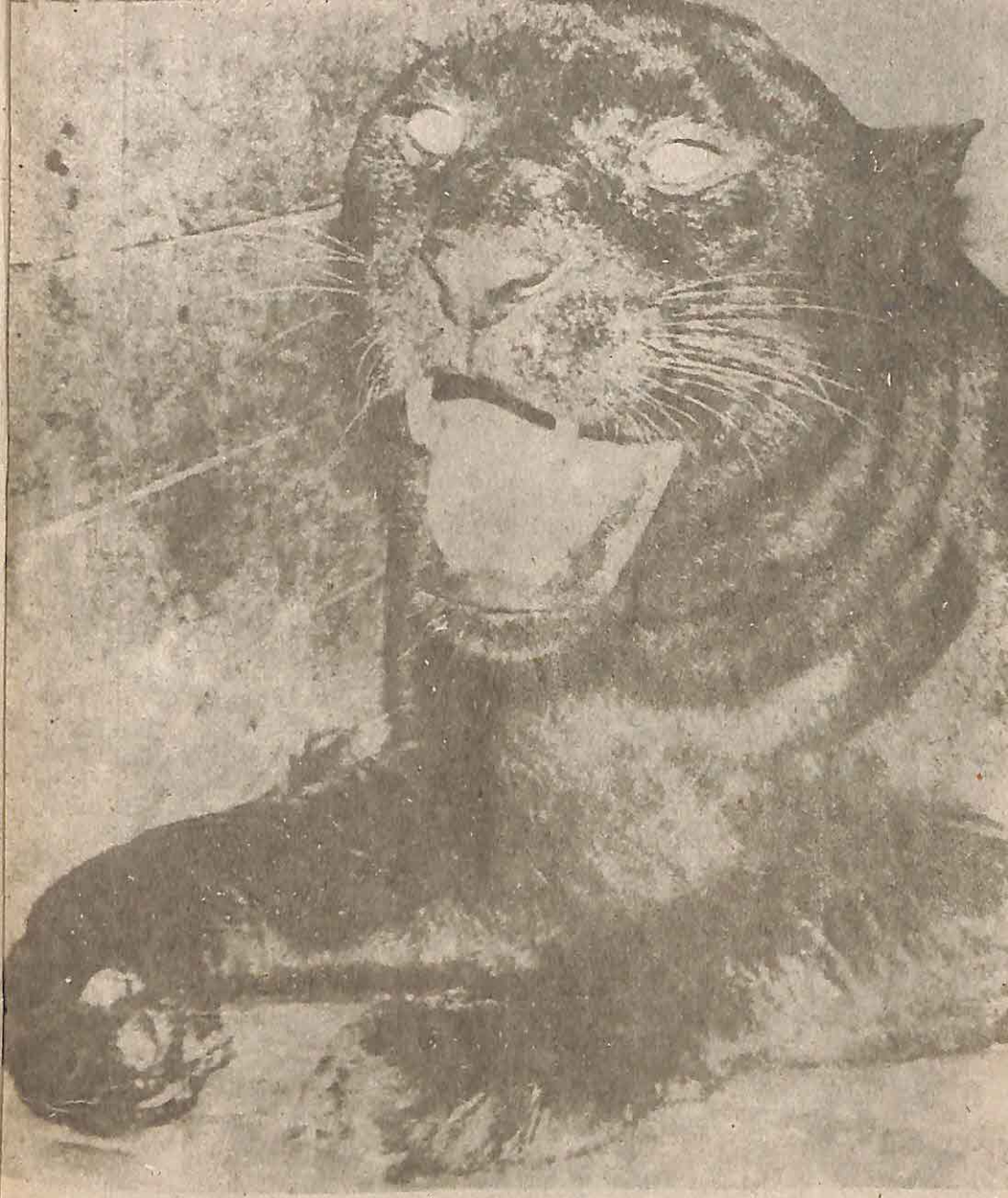

কালো চিতা তোলা

ভীষণ ভয় পায় বলে গায়ে এক ফোঁটা জলও লাগতে দেয় না। বাঘের মতই এদের শোনার ক্ষমতা তীক্ষ্ণ, তারপর দেখার আর সব শেষ শোঁকার। প্রয়োজনে শরীরটা খুব ছোট করে গুটিয়ে নিয়ে অল্প জায়গাতেই থাকতে পারে। দিল্লীর চিড়িয়াখানা থেকে একবার একটা কালো চিতা পনেরো সেন্টিমিটার চওড়া গরাদের মধ্যে দিয়ে অনায়াসে বেরিয়ে এসেছিলো। নাম ছিলো তার ভোলা

এরা সব রকম জন্তু-জানোয়ারই ধরে খায়। পছন্দ করে কুকুরের মাংস। ঘুমন্ত লোকের খাটিয়ার তলা থেকে নিঃশব্দে কুকুর তুলে নিয়ে যায়। বাঘের শিকার করা-লুকানো মাংস এরা অনেক সময় খেয়ে নেয়। তবে বাঘের মত পরিষ্কার করে খেতে পারে না। খাওয়া দেখেই বোঝ যায়— বাঘ খেয়েছে না চিতা। বাঘের মত এদের জিভের ওপর দিকটা শিরিষ কাগজের মত বেশ খরখরে আর নীচের দিকটা মাখনের মত মোলায়েম।

শিকারের ওপর এরা লাফিয়ে পড়ে না। বিদ্যুৎ গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মানুষখেকো চিতা ধরা খুব শক্ত। গাড়োয়ালের রুদ্রপ্রয়াগে এক মানুষখেকো চিতা একশো পঁচিশটা মানুষ মারে। আট বছর ধরে চেষ্টা করেও শিকারীরা একে ধরতে পারিনি। বেশ কয়েক মাস ধরে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বিখ্যাত শিকারী জিম করবেট তাকে খতম করেন।

মাচায় বসে বাঘের হাত এড়ানো যায়, চিতার নয়। হাতীকেও ভয় করে না। লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকে, সুযোগ বুঝলেই দে ঝাঁপ। আহত চিতা যেন সাক্ষাৎ যম। আহত চিতার খোঁজ করতে গিয়ে অনেক শিকারীই প্রাণ হারিয়েছেন। আহত বাঘের চেয়ে আহত চিতা খোঁজা শক্ত। তবে বাঘে ছুঁলে যেমন আঠারো ঘা, চিতায় তেমন নয়। চিতার হাত থেকে রেহাই পেয়ে অনেকেই বেঁচে আছে, কিন্তু বাঘের হাত থেকে নয়।

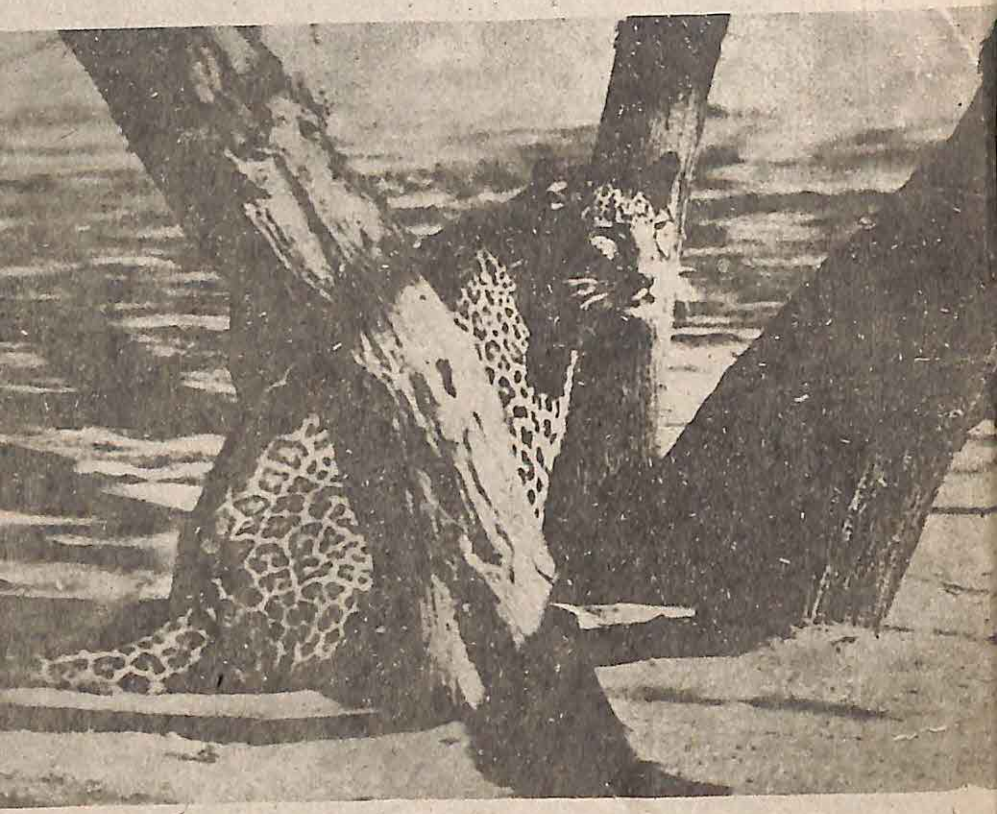

গাড়োয়ালের নামী শিকারী মুকুন্দিলাল তাঁর বারো নম্বর চিতার খোঁজ করতে গিয়ে প্রায় মরতে বসেছিলেন। তেহেরী সহরের এক গলিতে চিতাটি ঢুকে পড়ে একটি গাধাকে মারে। বন্দুক কাঁধে মুকুন্দিলাল চিতার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। সন্ধ্যের সময় চিতাটি ফিরে এসে যখন শিকার খেতে যাবে তখন মুকুন্দিলাল গুলি চালান। চিতার গায়ে লেগে গুলি বেরিয়ে যায়। আহত হয়ে চিতা পালায়। পরের দিন আবার চিতার খোঁজে মুকুন্দিলাল

মহারাজের পুরোনো মহলের বাগানে গিয়ে হাজির। চিতা একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিলো। ইট মেরে মুকুন্দিলাল তাকে ঝোপ থেকে বার করেই গুলি ছুঁড়লেন। কিন্তু এবারেও গুলি লাগলো না। চিতা ঝোপের মধ্যে আবার লুকিয়ে পড়লো। যারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিলো তারা ঝোপে ক্রমাগত ঢিল ছুঁড়তে লাগলো। এবারও ঝোপ থেকে বেরুলে মুকুন্দিলাল তাকে মারতে পারলেন না। এবার চিতা মুকুন্দিলালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কাঁধটা জোরে কামড়ে ধরে ঠ্যাং টানতে চেষ্টা করলো। মুকুন্দিলালের হাতে খালি বন্দুক, একটাও গুলি নেই তাতে। বন্দুককে লাঠির মত করে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। অনেক কষ্টে বন্দুকের বাঁট দিয়ে চিতার মাথায় কষে এক ঘা বসালেন। মাথা ফেটে চৌচির, বন্দুকটাও গেলো ভেঙ্গে। চিতাও শেষ। এই লড়াই বাড়ীর ছাদের ওপর থেকে অনেকেই ভিড় করে দেখে। মুকুন্দিলালকে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে বেশ কয়েক মাস হাসপাতালে কাটাতে হয়েছিলো।

ধূর্ত বলেই বোধ হয় শিকারী আসার আঁচ পেলেই উধাও হয়ে যায়। বাঘের চেয়ে চিতাই আমাদের দেশে বেশি। চিতা বাঘেরা যত সহজে শিকারীর হাত থেকে পালাতে পারে অত সহজে বাঘেরা নয়। যেখানে তিনটে বাঘ মারা হয় সেখানে চিতা মাত্তর একটা। চিতার ধূর্তমির অনেক গল্প আছে। চুপিসাড়ে শিকারীর সামনে দিয়ে টোপ নিয়ে এরা পালায়। শিকারী বেচারী বন্দুক হাতে অপেক্ষায় চুপচাপ বসে থাকে।

সাধারণত এরা মানুষের সামনে আসে না। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে কখনও কখনও রাস্তার চৌমাথায় এদের বসে থাকতে দেখা যায়। ১৯৬৭ সালে সাধারণ নির্বাচনের সময় কেরালাতে এক ভোট কেন্দ্রে এক চিতা বাঘ চুপচাপ গিয়ে হাজির। যেন ভোট দিতে এসেছে। বহরাইচ জঙ্গলের রেস্ট হাউসে এইরকমই একটা ঘটনা ঘটেছিলো। সারা বর্ষাকাল এক আহত

চিতা ছিলো এই রেস্ট হাউসের একটা ঘরে। এক ভদ্রলোক ঐ জায়গায় এক রাত কাটিয়ে পরের দিন সকালে চিতা-টিকে কোনোরকমে তাড়ান। চিতার বাচ্চাকে পোষ মানানো সহজ। অবশ্য এক বছরের বেশী পোষ মানে না। চিতা পোষা সত্যিই হাঙ্গামা।

আমাদের দেশে আরও দু'রকমের চিতা বাঘ আছে। 'হিম তেন্দুয়া' বা বরফের চিতা। কাশ্মীর কিংবা হিমালয়ের পশ্চিমে তিন হাজার তিনশো মিটার উঁচুতে এদের সাধারণত দেখতে পাওয়া যায়। এরা সমতলভূমির চিতা বাঘের চেয়ে আকারে ছোট। লম্বায় সওয়া দু'মিটার থেকে পৌনে তিন মিটার, ওজনে তেত্রিশ কিলোগ্রাম থেকে একচল্লিশ কিলোগ্রাম। ল্যাজ এক মিটারেরও বেশি লম্বা। উচ্চতায় পঁচাত্তর সেন্টিমিটার। মেটে রঙের গায়ের ওপর হাল্কা কালো ছোপ। পাহাড় কিংবা বরফে ঢাকা পাহাড়ে এদের গায়ের রঙ আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করে। লোহার তারের খাঁচায় ধরা হয়। গায়ের ছাল খুব দামী। লোমগুলো লম্বা লম্বা, নরম ও রেশমের মত।

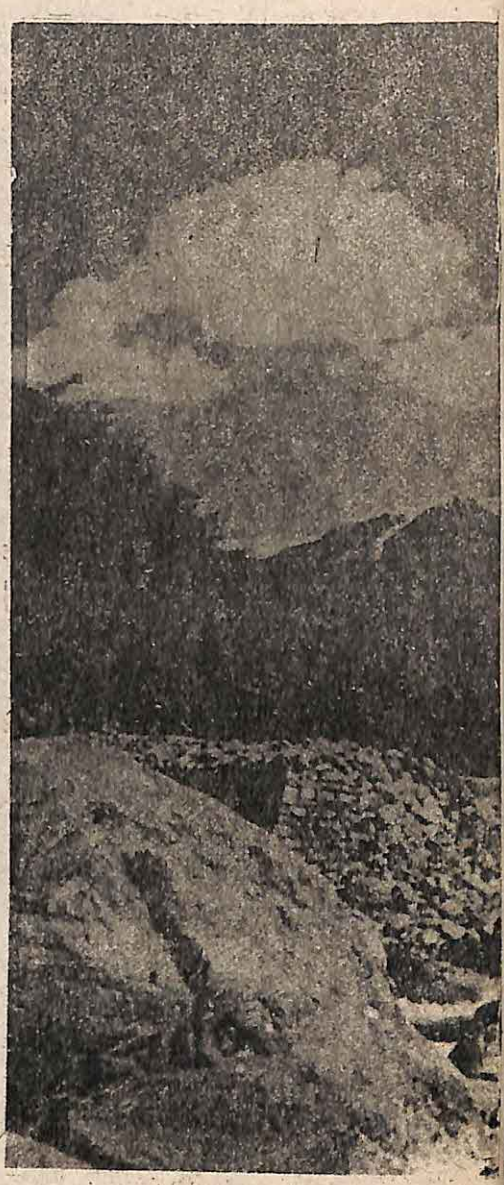

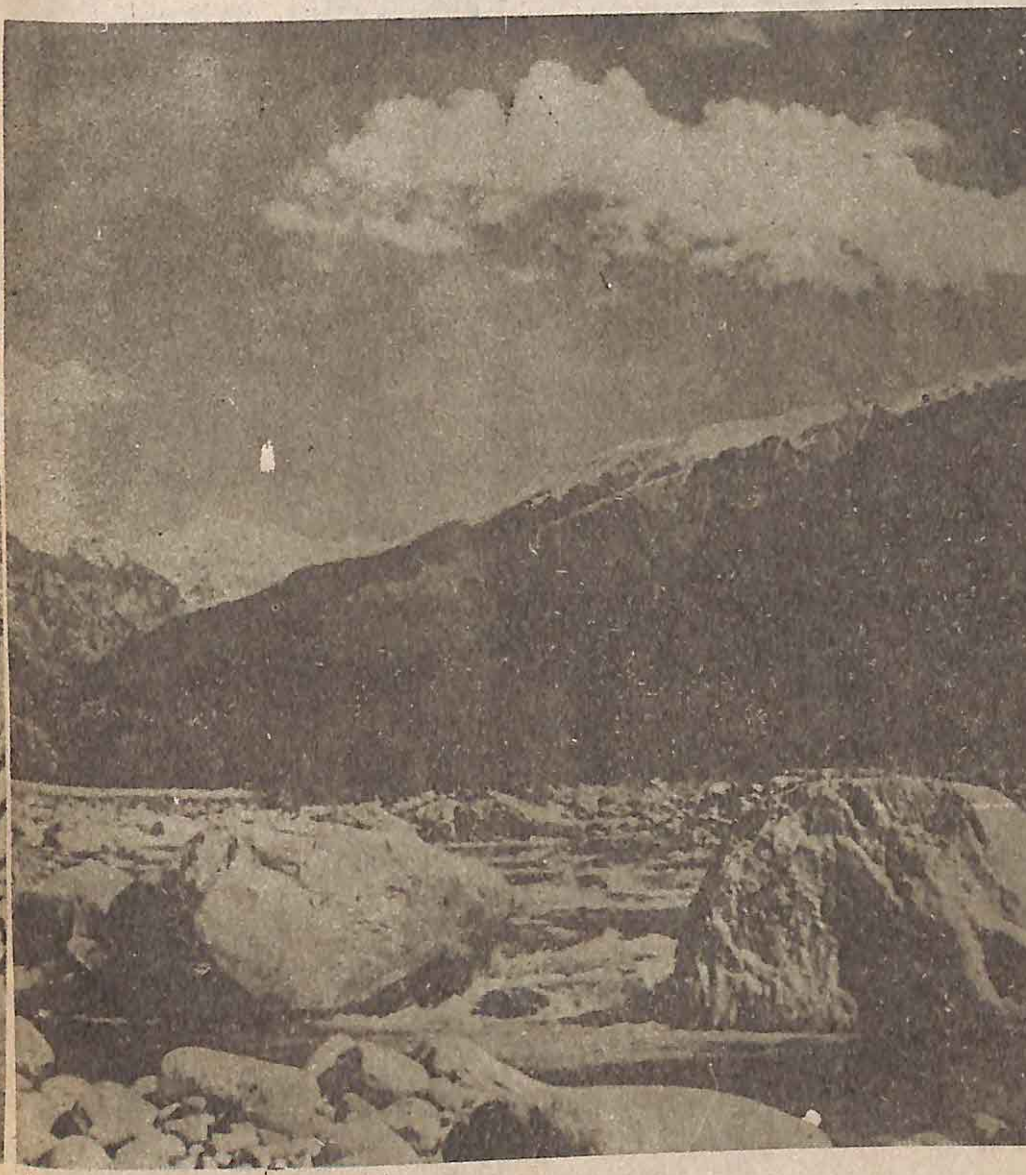

বরফের চিতার পাহাড়ী ডেরা

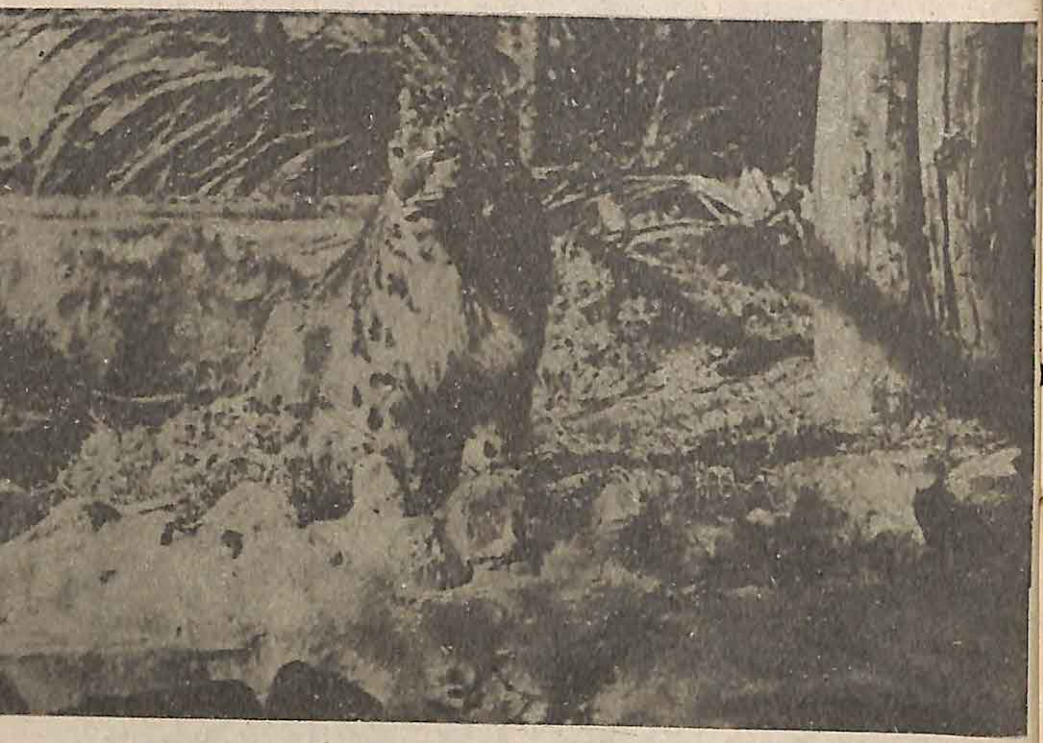

হিম তেন্দুয়া বা বরফের চিতা

দ্বিতীয় জাতের চিতার নাম 'ক্লাউডেড চিতা'। আমরা 'বাদুলে চিতা' বলতে পারি। পূর্ব হিমালয়ে, আসাম, সিকিম আর নেপালের ঘন জঙ্গলে এদের বাস। সাধারণত এরা গাছের ওপরেই থাকে। মেটে খাকী গায়ের রঙ, মাথায় আর ল্যাজে বড় বড় কালো ছোপ। গায়ের ছোপ খুব বড় ও চৌকো। ডোরাকাটা বলে অনেক সময় ভুল হয়।

বাদুলে চিতারা উচ্চতায় প্রায় আশী সেন্টিমিটার, লম্বায় ল্যাজ সমেত দেড় থেকে সওয়া দু'মিটার। ল্যাজটা একষট্টি থেকে নব্বই সেন্টিমিটার। ষোলো থেকে তেইশ কিলোগ্রাম এদের ওজন। পা এদের অন্য সব চিতার চেয়ে ভারী। থাবাগুলো চ্যাপ্টা ও পুরু। কষের দাঁত খুব লম্বা। মজবুতও খুব। বেশ চড়া দামে এই দাঁত বিক্রি হয়। বোর্ণিওর অধিবাসীরা কানের গয়না করে পরে। এরা পোষ মানেও সহজে। খাবার সময় বিরক্ত

না করলে মানুষ আক্রমণ করে না। বাদুলে চিতা সম্প্রতি দিল্লীর চিড়িয়াখানায় আনা হয়েছে।

আমাদের দেশের চিতা বাঘের নিকট আত্মীয় আমেরিকার 'জাগুয়ার'।

ক্লাউডেড লেপার্ড বা বাদুলে চিতা

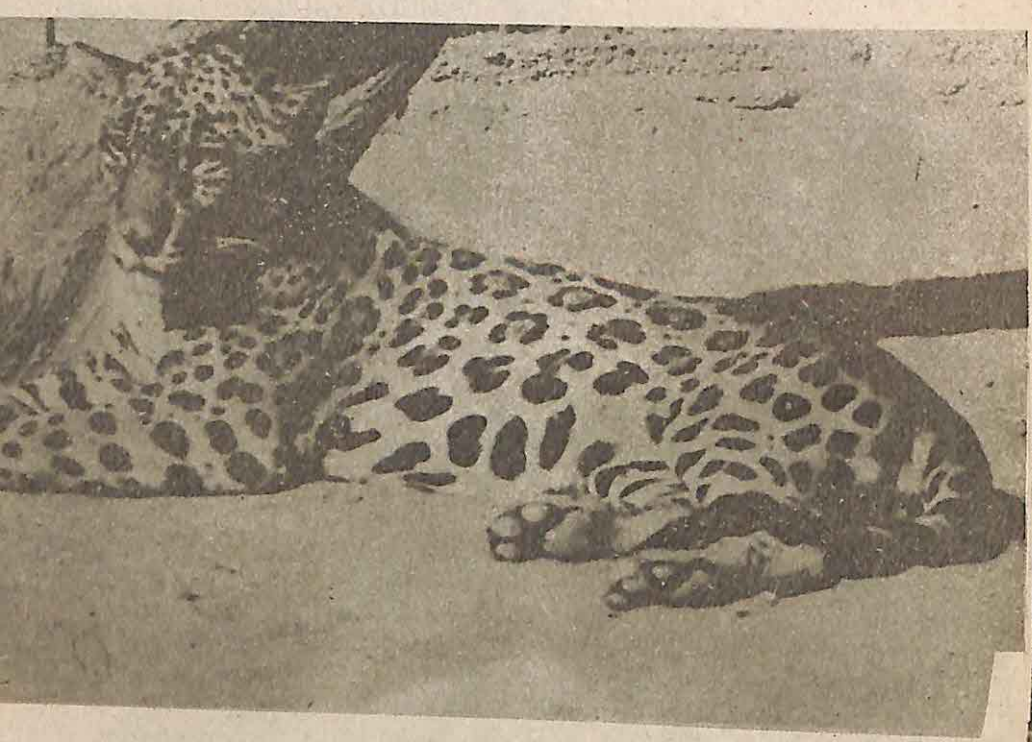

জাগুয়ার

আমেরিকা ছাড়া আর কোথাও নেই। আমাদের চিতা বাঘের চেয়ে আকারে বড়, ওজনে ভারী। রঙচঙে ও ছোপকাটা। খাড়া কান, কানের পেছনটা একেবারে কালো। নীচের ঠোঁটে একটা ঘন কালো ছোপ। জল দেখে ভয় পায় না। খুব ভালো সাঁতারু। বন্দী অবস্থায় মহানন্দে থাকে। চিতার মত অত বাধ্য নয় বলে এদের পোষ মানানো শক্ত।

শিকারী চিতা

শিকারী চিতাও বেড়াল পরিবারের। কুকুরের সঙ্গে কিন্তু এর বেশ সাদৃশ্য। পা কুকুরের মত লম্বা। গড়নটুকু ছাড়া বাকী সব বেড়াল পরিবারের অন্য সব জানোয়ারের চেয়ে ভিন্ন। শিকারী চিতা দুরকমের। আফ্রিকার খোলামেলা জঙ্গলে যে ধরণের শিকারী চিতা পাওয়া যায় আমাদের শিকারী চিতাও তাই। এদের উচ্চতা চিতা বা গুল বাঘের চেয়ে বেশি। তাই ল্যাজ পর্যন্ত ধরলে লম্বায় দুই থেকে আড়াই মিটার। শুধু ল্যাজটাই ষাট থেকে পঁচাত্তর সেন্টিমিটার। উচ্চতায় এক মিটার, ওজন পঞ্চাশ থেকে পঁয়ষট্টি কিলোগ্রাম। বাচ্চারা মায়ের পেটে নব্বই দিন থাকে। একসঙ্গে দুটো থেকে চারটে বাচ্চা জন্মায়।

এদের গায়ের রঙ ও ছোপ চিতা বা গুল বাঘের মত। ছোপগুলো গাঢ় কালো রঙের—এই যা তফাত। বাচ্চাদের গায়ের চামড়া হাল্কা নীলচে পীত রঙের রেশমের মত। যত বড় হয়, ছোপগুলো তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মাথাটা শরীরের অনুপাতে ছোটো, মুখ চিতার চেয়ে চ্যাপ্টা। চোখের জলের

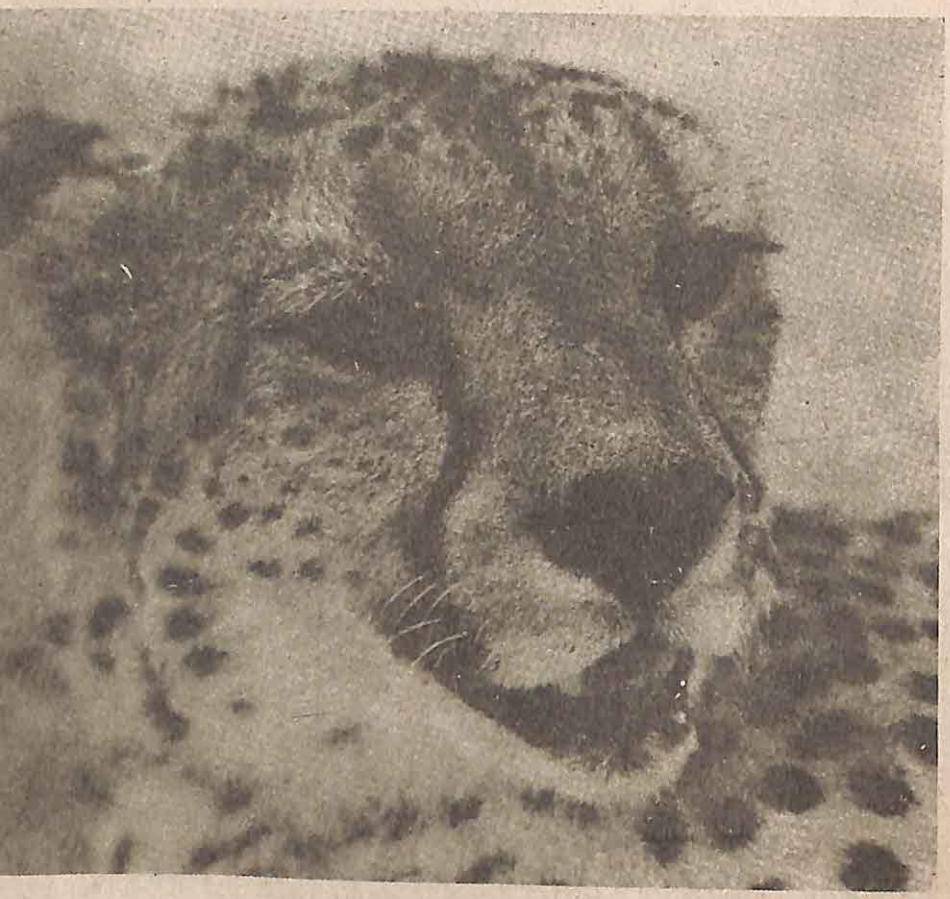

মত চোখের কোল বেয়ে দুটো কালো দাগ নাকের পাশ দিয়ে মুখের দুদিকে মিলেছে। ছোট্ট কান, চোখের তারা গোল। শক্ত লোম, ঘাড়ে ঝাঁকড়া

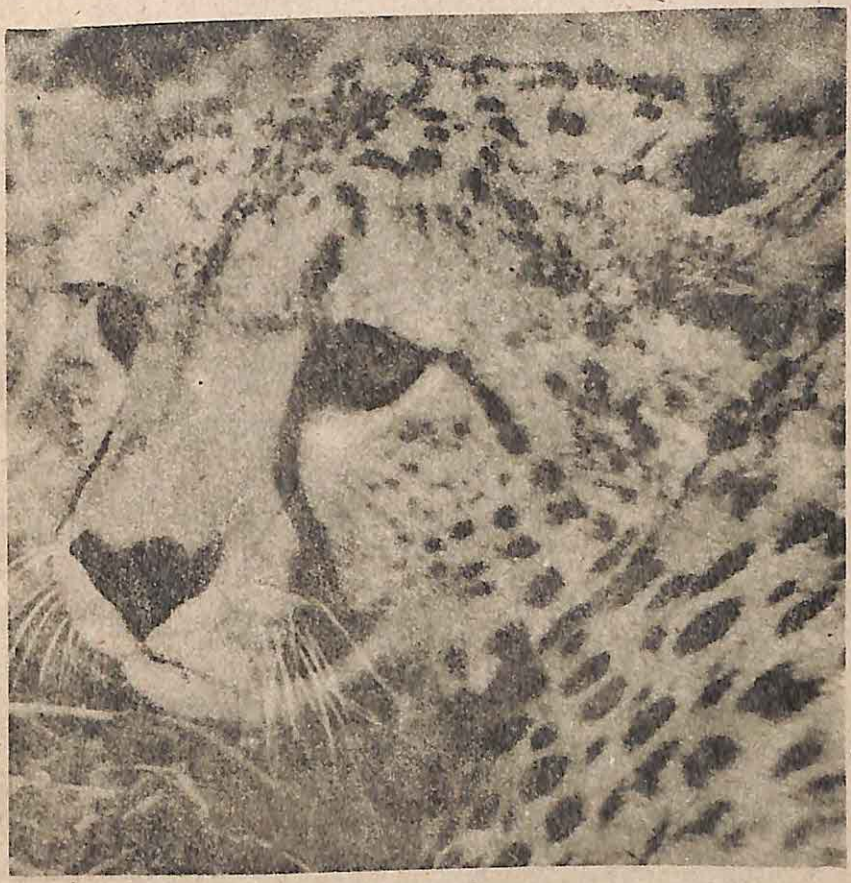

চুল। নখগুলো পুরোপুরি থাবা দিয়ে ঢাকা নয়। বেড়ালের মত নখগুলোও পুরো গোটাতে পারে না। আর সবার মত এরাও গাছের ছালে নখ

শানিয়ে ধারালো করে। তফাত শুধু একই গাছের ছালে বারবার নখ শানায়। এদের ধরতে শিকারীরা এইসব গাছের চারদিকেই ফাঁদ পাতে। শিকারী চিতার দাঁত চিতার দাঁতের চেয়ে ছোট।

এদের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। চোখ দিয়েই এরা শিকার করে। শোঁকার ও শোনার ক্ষমতা কম। তাই হাবভাব ও চালচলন চিতার ঠিক বিপরীত। এরা দিনে শিকার করে, চিতা রাতে।

জন্তুদের মধ্যে এরাই সবচেয়ে জোরে দৌড়োয়। হরিণ, চিতলদের পিছু পিছু ছ-সাত কিলোমিটার ছুটে ধরে খায়। চুপিচুপি নিঃসাড়ে শিকার খোঁজে। শিকার নজরে পড়লেই লাফিয়ে ধাওয়া করে। চোখের পলকে একশো কিলোমিটার বেগে দৌড় মারে। শিকার ধরেই মেরে খায়। শিকার মেরে ঝোপেঝাড়ে টেনে নিয়ে যায় না, লুকিয়ে রাখারও চেষ্টা নেই। এধার-ওধার ছড়িয়ে খায়। খাওয়া বড় নোংরা।

আমাদের দেশের পশ্চিমের সমতলভূমি, মধ্যভাগের উচ্চভূমি দাক্ষিণাত্য অবধি পুরো এলাকায় এককালে শিকারী চিতা পাওয়া যেত। শিকারী চিতা এখন আর নেই বললেই হয়। 1951 সালে অন্ধ্রপ্রদেশে একজোড়া শিকারী চিতা শেষবারের মত দেখা গিয়েছিলো।

আগেকার দিনে শিকারের জন্যে রাজামহারাজারা কুকুর-হাতীর সঙ্গে শিকারী চিতাও পুষতেন। শিকারী চিতা নিয়ে শিকার করায় বেশ একটু দক্ষতার প্রয়োজন। শিকারী চিতার চোখ বেঁধে গরুর গাড়ীতে করে জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হোত। শিকার দেখতে পেলে চোখের বাঁধনটা খুলে নেওয়া হোত। শিকার দেখেই এরা পাঁই পাঁই করে ছুট দিতো। শিকার ধরেই ঘাড় মটকাতো পারিশ্রমিক হিসেবে এদের খানিকটা মাংস দেওয়া হোত। তাই পেয়েই এরা মহা খুশী। এইরকমই এদের শিক্ষা দেওয়া হোত।

ছুটলে শিকারী চিতাকে খুব সুন্দর দেখায়। চলন কিন্তু বড় বিশ্রী।

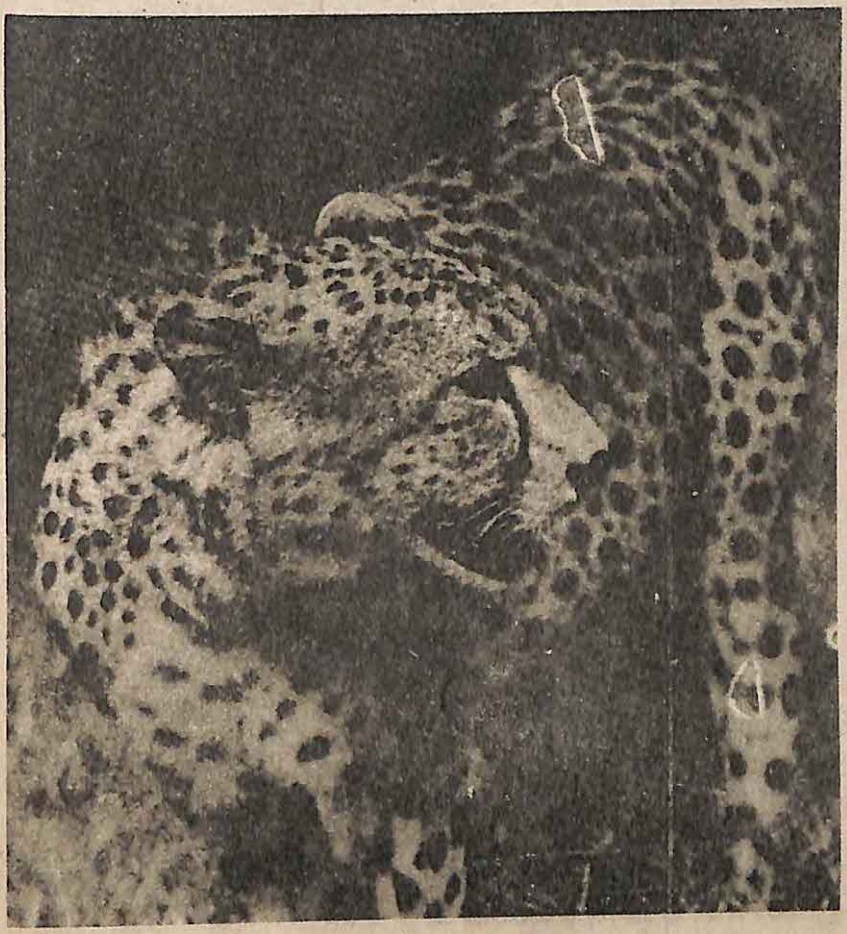

সাদাসিধে ও বাধ্য বলে সহজেই পোষ মানে। মালিকের দেওয়া নাম আর সেইসঙ্গে মালিকের নাম তাড়াতাড়ি মনে রাখতে শেখে। শিকারী চিতা বন্দী অবস্থায় থাকতে পারে। বন্দী অবস্থায় খুব কম বাচ্চা দেয়।

পোষা ও জংলী বেড়াল

নানান জাতের প্রায় পঁচিশ রকমের বেড়াল আছে। পৃথিবীর সব জায়গাতেই এদের বাস। অষ্ট্রেলিয়া, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, মাদাগাস্কার, আর কয়েকটি দ্বীপেই যা এদের পাওয়া যায় না। কবে ও কোথায় প্রথম বেড়াল পোষা হয়েছিলো বলা মুশকিল। কিন্তু অনাদি কাল থেকে লোকে বেড়াল পোষে। অতি প্রাচীন কাল থেকে আমাদের গ্রামে ও সহরে বেড়াল পোষা হচ্ছে। নানান রঙের বেড়াল—বাদামী, কালো, সাদা, সোনালী, ধূসর আর রঙবেরঙের ছোপওয়ালা। জংলী বেড়ালদের মধ্যে কারুর বা গায়ে ডোরাকাটা কিংবা ছোপ দেওয়া।

ল্যাজ নিয়ে বেড়াল লম্বায় ষাট থেকে আশী সেন্টিমিটার। ওজন চার থেকে আট কিলোগ্রাম। মেনী বেড়ালরা ওজনে এক থেকে দেড় কিলোগ্রাম কম। উচ্চতায় কুড়ি থেকে পঁচিশ সেন্টিমিটার। এরা দিনে ঘুমোয়, রাতে শিকার ধরে।

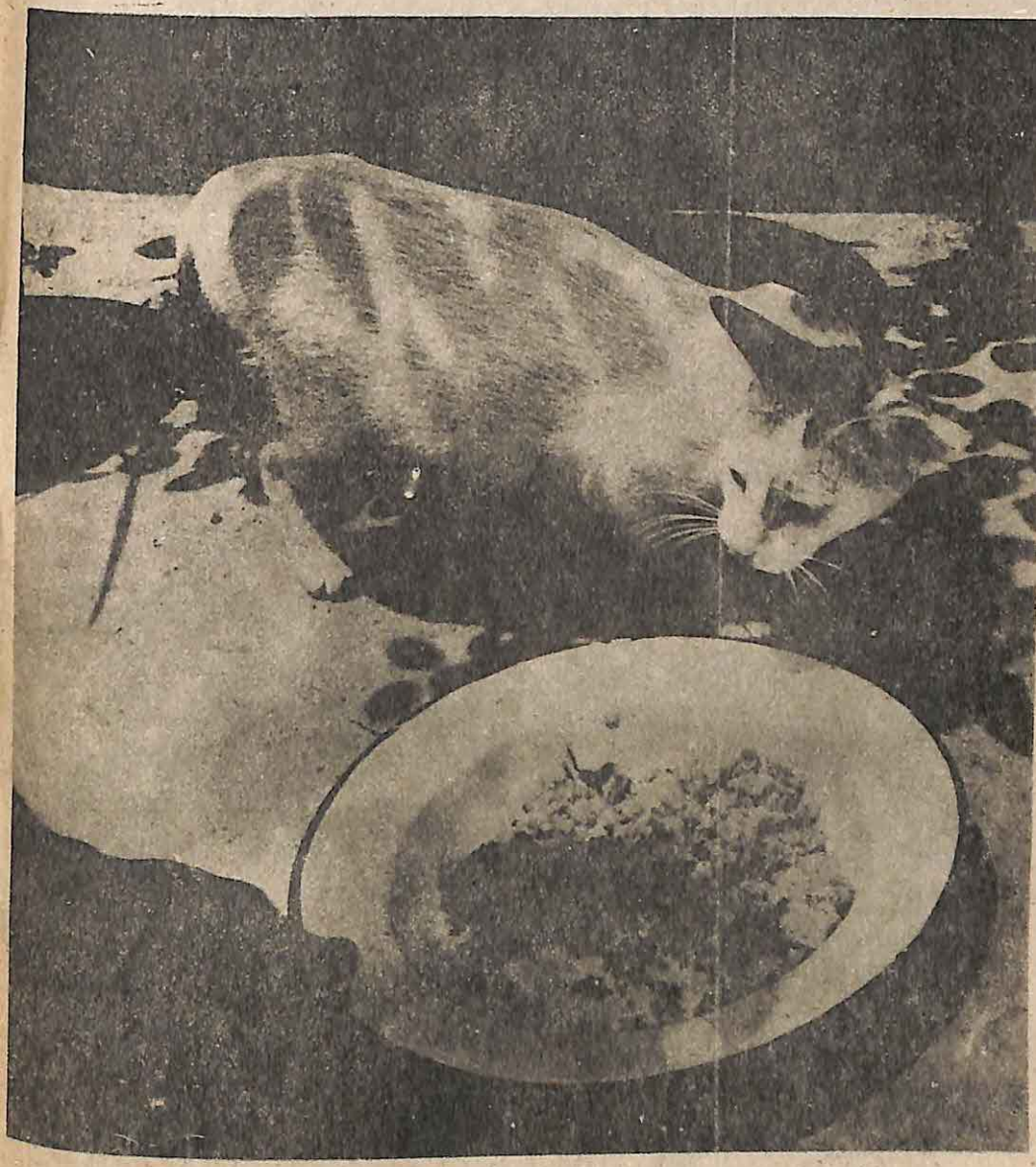

আঙ্গুলে ভর দিয়ে গুড়ি মেরে হাঁটে। জিভ দিয়ে চেটে অনবরত গা পরিষ্কার করে। এদের অভ্যেসও খুব পরিষ্কার, স্বাভাবিক গুণ। আকার, গড়ন, রঙ আর কাঠামোয় এদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও হাবভাব ও চালচলনে সবাই এক।

সামনের দু'পায়ে পাঁচটা করে নখ, পেছনের দুপায়ে চারটে করে। হাঁটার সময় নখগুলো থাবার মধ্যেই লুকোনো থাকে। চোখ খুব বড়, নাক ও কান ছোট, মুখ চ্যাপ্টা। চোখের তারা তেরছা, গোল নয়। যা পায় তাই খায়, বাছবিচার নেই। ছোট পাখী, কাঠ বেড়ালী আর নেংটী ইঁদুর ধরে খায়। বেড়াল জলের ধারে কাছেও ঘেঁষে না। মানুষকে কখনও এরা আক্রমণ করেছে বলে শোনা যায়নি। কেউ যদি এদের অজান্তে মাড়িয়ে ফেলে তাহলে এরা কামড়ায় বা খিমচোয়।

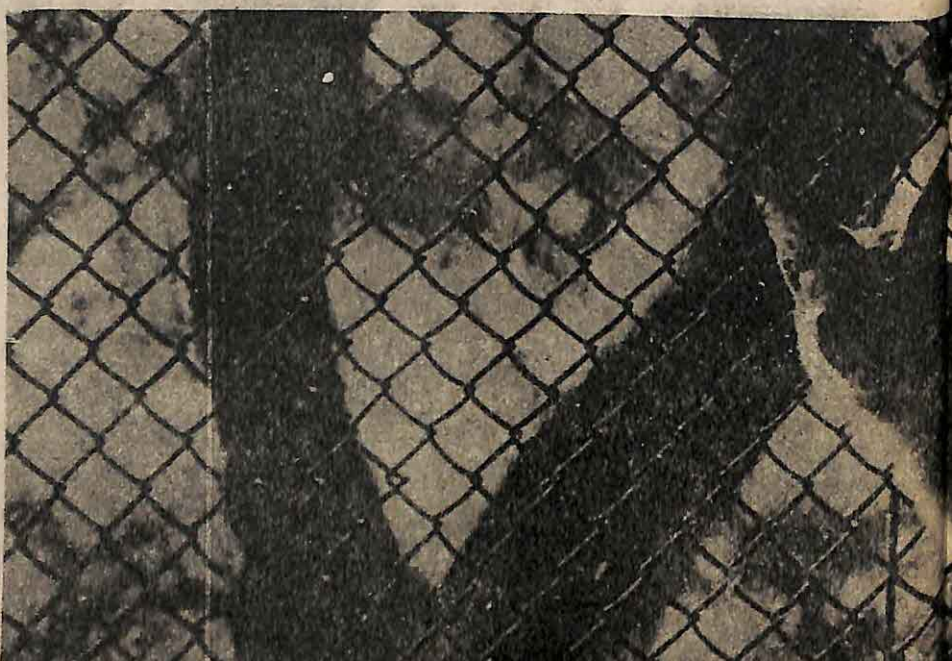

পোষা বেড়াল যে স্বাধীনচেতা কে না জানে। খিদে পেলে ল্যাজ খাড়া করে ম্যাঁও ম্যাঁও করে মনিবের কাছে খাবার চায়। মনিবের পায়ের সঙ্গে নিজের গা ঘষে। পেট ভরে খাবার পরই নিজের পথ দেখে। সত্যি বলতে কি বেড়ালকে ঘরে পালন করা যায় কিন্তু পোষা যায় না। মনিবের চেয়ে এরা যে জায়গায় থাকে সেই জায়গাটাই বেশি ভালোবাসে। কাছেপিঠে কোথাও বেড়ালকে ছেড়ে দিয়ে দেখতে পারো। দেখবে শিগগিরই ঘুরে ফিরে সে নিজের ডেরায় ফিরে এসেছে।

ইংল্যাণ্ডের নামকরা পূর্বতন প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ বেড়াল সম্বন্ধে এক সুন্দর গল্প বলেছেন: মহাত্মা গান্ধী তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে গিয়ে ছিলেন। গান্ধীজি জর্জের বসার ঘরে এসে বসামাত্রই একটা বেড়াল তাঁর কোলেতে গুটিসুটি মেরে বসে। যতক্ষণ গান্ধীজি ওখানে ছিলেন, বেড়ালও

জংলী বেড়াল

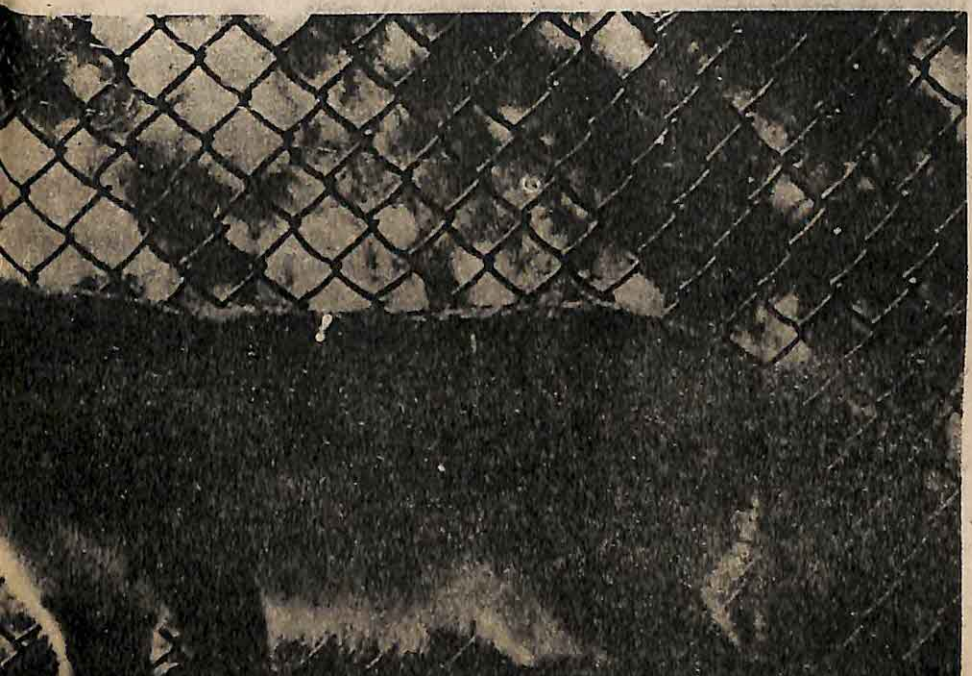

তাঁর কোলে বসেছিলো। গান্ধীজি উঠে পড়তেই বেড়ালটাও ঘর ছেড়ে চলে যায়। লয়েড জর্জ এর আগে এই বেড়ালটাকে কখনও দেখেন নি। কি কোরে এবং কোথা থেকে সে এসেছিলো তাও তিনি জানেন না।

মেনী বেড়াল বছরে দুবার বাচ্চা দেয়, এক সঙ্গে চার পাঁচটা, বাঁচে মাওর দু'একটা। জন্মাবার পর থেকে পনেরো দিন অবধি ছানাদের চোখ বন্ধ থাকে। মেনী বেড়ালরাই বাচ্চাদের বড় করে, বেড়ালদের ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয় না, কেননা, বেড়ালরা নিজেদের ছানাদেরই খেয়ে ফেলে। মেনী বেড়ালরা বাচ্চাদের ঘাড়ের চামড়া মুখে করে ধরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। তিন মাস ছানাদের দেখাশোনা করে, তারপর ছেড়ে দেয় চরে খাবার জন্যে। বেড়াল পঁচিশ বছর অবধি বাঁচে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন আকারের বেড়াল পাওয়া যায়। ইরাণের নীল লোমওয়ালা পার্সিয়ান বেড়াল ও শ্যামদেশের বেড়াল খুবই নামজাদা।

নানান জাতের জংলী বেড়ালও আছে। পোষা বেড়ালের চেয়ে এরা দেখতে অনেক বড়। আসাম ও নেপালে একজাতের বড় জংলী বেড়াল পাওয়া যায়। দেখতে অনেকটা 'ক্লাউডেড লেপার্ড' বা বাদুলে চিতার মত। এছাড়া আরও এক জাতের বেড়াল আছে, দেখতে এদের খুব সুন্দর। গায়ের রঙ সোনালী, বেড়ালদের স্মৃতিশক্তি খুবই কম। বিপদ, আঘাত কিংবা বিশ্বাস ভঙ্গের কথা এরা খুব সহজেই ভুলে যায়। বেড়ালকে মাড়িয়ে ফেললে অনেক সময় কামড়ে দেয়। কামড়েই ভয়ে পালায়। আবার পরক্ষণেই খাবার চাইতে ফিরে আসে।

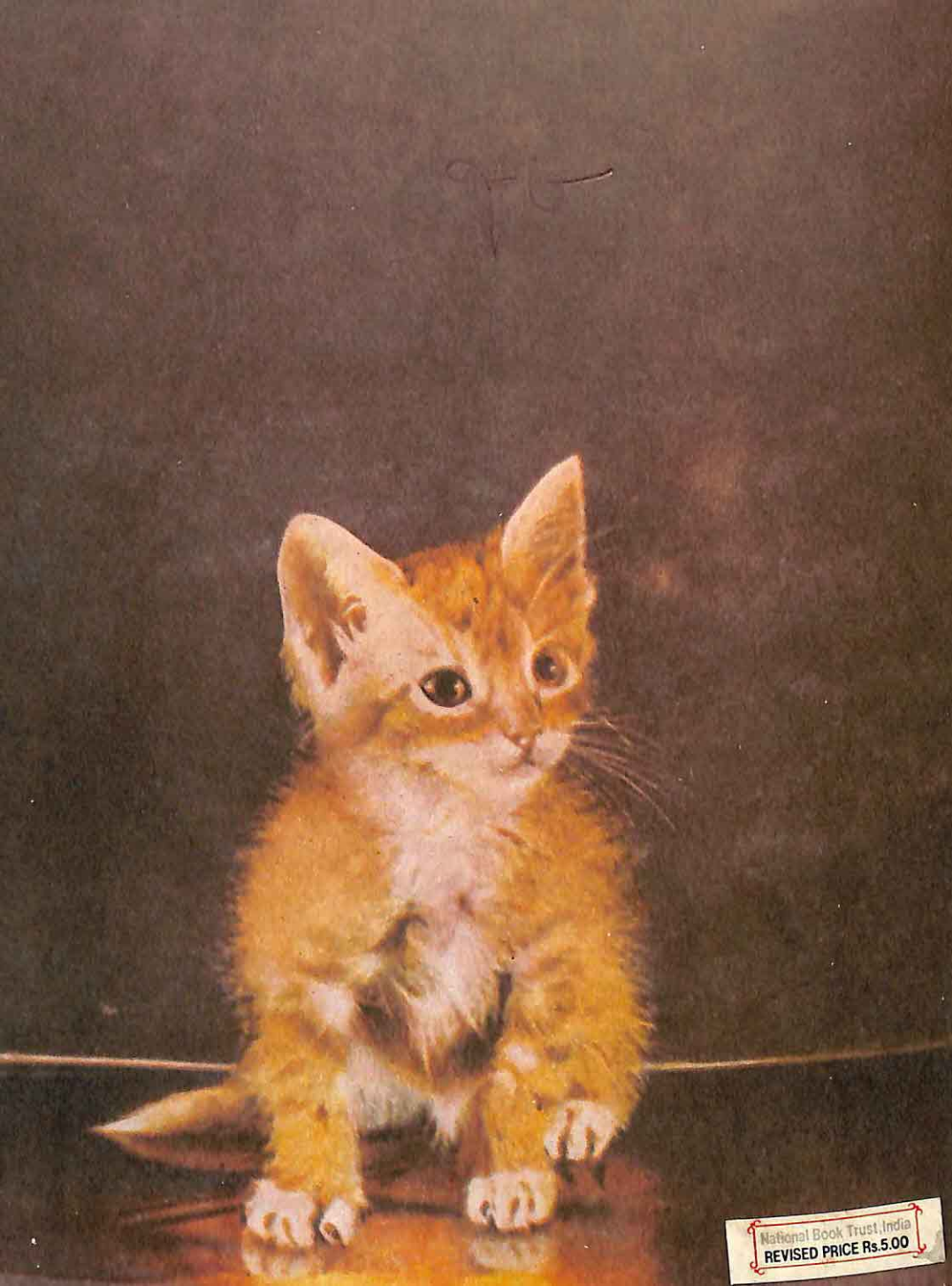

National Book Trust, India
REVISED PRICE Rs.5.00